আইএফডি'র দুই বছর ৩৩ দিন

মাবরুর মাহমুদ

আইএফডি স্পেশাল আর্টিকেল ৪

সেপ্টেম্বর ১৬, ২০১১

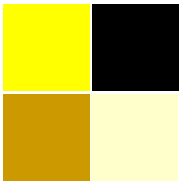

[এই রচনার সকল মন্তব্য এবং যে কোন ভুল ভ্রান্তির জন্য লেখক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। এর জন্য অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দায়ী নয়]

©IDEAS FOR DEVELOPMENT (IFD)
ideasfd@gmail.com
www.ideasfd.org

আইএফডি'র দুই বছর ৩৩ দিন

বিগত ১৩ আগষ্ট ২০১১ ছিল ভার্চুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাঙ্ক **আইডিয়াস ফর ডেভলপমেন্ট (আইএফডি)** 'র দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী।

নিজের বা প্রতিষ্ঠানের জন্মদিন পালন করার রেওয়াজ মানব সমাজে দীর্ঘদিন থেকেই প্রচলিত রয়েছে। নিজের জন্মদিনে মানুষ আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে দাওয়াত করে, কেক কেটে-মোমবাতি জ্বালিয়ে আনন্দফূর্তি করে। এই ধারা ব্যক্তি পর্যায়ে ছাড়াও প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়েও দেখা যায়।

নিজের প্রতিষ্ঠানের জন্মদিন ঘটা করে পালন করার ধারা এখন সবচেয়ে বেশি প্রচলিত বিভিন্ন ইলেকট্রোনিক মিডিয়ার প্রাইভেট চ্যানেলগুলিতে। বাংলাদেশে এখন এতো সংখ্যক প্রাইভেট চ্যানেল হয়েছে যে, প্রায় প্রতি মাসেই দেখা যায় কোন না কোন চ্যানেলের জন্মদিন পালন করা হচ্ছে। এই দিনে চ্যানেল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে দাওয়াত দেন, কেক কেটে একে অপরকে শুভেচ্ছা প্রদান করেন। সাথে সাথে একটি র‍্যালি বা রঙ-বেরঙের মিছিল বের করে সবাইকে জানিয়ে দেয়া হয় জন্মদিনের শুভ সংবাদটি।

তবে আইএফডি একটি অনলাইন মিডিয়ার মত ভূমিকা পালন করলেও আমরা আমাদের জন্মদিনটি ঘটা করে পালন করিনি। এর কারণ হল, প্রথমত আমরা মুল ধারার মিডিয়া নই, একটি ভার্চুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাঙ্ক মাত্র, এবং দ্বিতীয়ত, আমরা অহেতুক প্রচার প্রচারণায় খুব একটা বিশ্বাসী নই।

তাই জন্মদিনটি আর উদযাপন করা হয়নি।

তবে বেশ কিছুদিন যাবৎ আমাদের মনে একটি তাগিদ কাজ করছিল যে, অন্তত দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে একটি স্পেশাল আর্টিকেলের মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দেয়া উচিত আমরা বিগত দুই বছরে কি কি বলেছি, এবং এই কথাগুলো বলার পিছনে আমাদের মুল

উদ্দেশ্য কি ছিল। বিগত দুই বছরে এই উদ্দেশ্য পূরণ কতটুকু হয়েছে, তা সমাজে কতটুকু ইতিবাচক অবদান রেখেছে, তা বিচারের দায়িত্ব আমরা আইএফডি'র পাঠকদের হাতেই তুলে দিতে চাই। তাই আজ আমরা আইএফডি'র সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে কোন প্রকার গভীর আলোচনায় যেতে চাই না।

পাঠকরা এখানে প্রশ্ন করতে পারেন, এই আর্টিকেলের শিরোনামে আইএফডি'র দুই বছর না হয় বোঝা গেল, কিন্তু অতিরিক্ত ৩৩ দিনের মাজেজাটা কি?

এর মাজেজা আসলে কিছুই নয়।

এই আর্টিকেলটি জন্মদিনের দিনই প্রকাশ করার একটি আগাম ইচ্ছা মনে মনে থাকলেও প্রাত্যহিক কাজের চাপে তা আর হয়ে ওঠেনি। তাই বিগত ঈদের ছুটিতে কিছুটা সময় পেয়ে আর দেরি করিনি। কিন্তু ঈদের পরই শুরু হল বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া তিস্তা ঝড়। এই ঝড়ের মধ্যে যদি আমি সবাইকে এই নিরামিষ আর্টিকেলটি পাঠাই, তাহলে কে পড়বে আমার এই লেখা? তাই আরো কিছুদিন অপেক্ষা। কিন্তু ততদিনে চলে গেছে আরো মূল্যবান ৩৩টি দিন।

তবে শিরোনামের এই ভিন্নতার কোন গভীর তাৎপর্য না থাকলেও এই ভিন্নতা কিছুটা হলেও আইএফডি'র নতুন পাঠককুলকে এই আর্টিকেল পড়তে আকৃষ্ট করবে বলে আমরা মনে করি।

এই আর্টিকেলে আমরা আলোচনা করেছি বিগত দিনগুলিতে বিভিন্ন পেপার এবং আর্টিকেল প্রকাশ করার মাধ্যমে আমরা কি কি বলতে চেয়েছি, এবং বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এই কথাগুলো কতটুকু প্রাসঙ্গিক।

এই আর্টিকেলে আমরা আমাদের প্রকাশিত বিভিন্ন পেপারের নির্বাচিত অংশ তুলে ধরেছি পাঠকদেরকে একটি রিক্যাপ দেয়ার জন্য। সেই সাথে আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর সাথে এই নির্বাচিত মন্তব্যগুলির কতটুকু মিল এবং অমিল রয়েছে, তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে খুঁজে দেখার।

এর পাশাপাশি এই আর্টিকেলে আমরা আলোচনা করেছি আইএফডি উদ্ভাবিত কালোটাকা–সাদাটাকা সংক্রান্ত তত্ত্বের পরিণতি, এর সাথে সম্পর্কযুক্ত শেয়ার বাজারের ধ্বস সম্পর্কে আইএফডি'র আগাম সাবধানবাণী, এবং আজ থেকে দুই বছর আগে সরকারের শীর্ষ মহলে আইএফডি'র পাঠানো একই সাবধানবাণী সম্বলিত চিঠির বিবরণ।

আশা করি, আর্টিকেলটি পাঠকদের ভাল লাগবে। এনজয়!

আইএফডি পেপারস

বিগত দুই বছরে আইএফডি যে সকল পেপার এবং আর্টিকেল প্রকাশ করেছে, তার একটি সারসংক্ষেপ দিয়ে আজকের মূল লেখাটি শুরু করা যাক।

২০০৯ সালের ১৩ আগষ্ট আইএফডি'র যাত্রা শুরু হয়েছিল '**অবয়বহীন দুর্নীতি**' শিরোনামে একটি এক্সক্লুসিভ পেপার প্রকাশ করার মাধ্যমে। এই পেপারে আমরা দুর্নীতির কারণ, এর সম্ভাব্য সমাধান এবং দুর্নীতির ব্যাপ্তি নিয়ে আলোচনা করেছি। দুর্নীতির সমাধান প্রস্তাব করতে গিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি **প্রশাসনে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের এম এম মডেল** যার মূল বক্তব্য হল, যে বিভাগ বা অফিসারের ক্ষমতা অত্যধিক, সেই বিভাগ বা অফিসারের জবাবদিহিতা এবং বেতন ভাতাও অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি হতে হবে। সুতরাং সকলকে একই বেতন কাঠামো এবং একই জবাবদিহিতার কাঠামোর মধ্যে রাখলে দুর্নীতি কমবে না। দুর্নীতি কমাতে হলে ক্ষমতার ক্রমানুসারে বিভাগওয়ারী ভিন্ন ভিন্ন বেতনভাতা এবং জবাবদিহিতার কাঠামো থাকতে হবে।

রাজনৈতিক দুর্নীতির সমাধান আলোচনা করতে গিয়ে আমরা আওয়ামী লীগের প্রস্তাবিত একটি সমাধান সমর্থন করেছি যা আওয়ামী লীগ নের্তৃবৃন্দ ২০০৫ সালে জনসমক্ষে প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এই প্রস্তাবটি তার একটি আর্টিকেলেও উল্লেখ করেছিলেন। এই প্রস্তাবের আওতায় নির্বাচনের প্রচারণার ভারটি একটি তৃতীয় পক্ষ তথা নির্বাচন কমিশনের হাতে ন্যস্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে যা বাস্তবায়িত হলে রাজনৈতিক দুর্নীতি অনেকাংশে কমে আসবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

এই পেপারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই পেপারে আমরা আলোচনা করেছি **বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতি** বা Intellectual Corruption এর স্বরূপ এবং সমাজে এই ধরণের দুর্নীতির প্রভাব। আমাদের জানামতে, বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতি নিয়ে এতো ব্যাপক পরিসরে আলোচনা পৃথিবীর আর কোথাও আগে কখনো হয়নি।

এই পেপারটির শেষাংশে আমরা আলোচনা করেছি, কালো টাকা-সাদা টাকা সংক্রান্ত আইএফডি'র প্রস্তাবিত তত্ব যেখানে বলা হয়েছে, একটি কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযান ছাড়া কালো টাকা সাদা করার পদক্ষেপের কোন অর্থনৈতিক গুরুত্ব নেই। সেই সাথে আমরা এটাও বলেছি, বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতি নির্মুল করার জন্য কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়ার বিকল্প কিছু নেই।

এর পরবর্তীতে আইএফডি তার প্রথম স্পেশাল আর্টিকেল প্রকাশ করে ২০১০ সালের ২২ জানুয়ারী। আর্টিকেলটির শিরোনাম '**বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড, মৃত্যুদন্ডের বিধান এবং কিছু কথা**'। এই আর্টিকেলটি আমরা লিখেছিলাম বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের ফাঁসি কার্যকর হওয়ার মাত্র কিছুদিন আগে। এই আর্টিকেলের মাধ্যমে আমরা সবার সাথে শেয়ার করেছি মৃত্যুদন্ডের বিধান সম্বন্ধে আমরা কি মনে করি, কোন পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা হয়েছিল এবং এই হত্যাকান্ডকে ইসলাম সমর্থন করে কিনা। পরিশেষে আমরা বঙ্গবন্ধু পরিবারের জীবিত দুই সদস্য মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার বোন শেখ রেহানার কাছে পরোক্ষ আবেদন জানিয়েছিলাম বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের ক্ষমা করে দেয়ার জন্য।

২০১০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী আইএফডি তার প্রথম পলিসি পেপারটি প্রকাশ করে। পেপারটির শিরোনাম '**ঢাকা নগরীর যানজট নিরসনে আইএফডি'র প্রস্তাবনা**'। এই পলিসি পেপারটিতে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি ঢাকা নগরীর যানজটের মুল কারণ, এবং তার সমাধানকল্পে সরকারের করণীয়।

এই পেপারটি তৈরি করতে গিয়ে আমরা জানতে পারি ঢাকা নগরীর যানজট নিরসন করার জন্য বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে **ঢাকা'র কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা** বা এসটিপি নামে একটি ২০ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল ২০০৮ সালে যার কিছুই এই পেপারটি লেখা পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। তাই এই ব্যাপক ভিত্তিক পরিকল্পনাটির ব্যাপারে

জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য আমরা আলোচিত পেপারে এসটিপি'র বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমাদের ধারণা বাংলা ভাষায় এসটিপি'র বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এর আগে কখনো হয়নি।

এসটিপি'র উপর আলোকপাত করা ছাড়াও আমরা এই পেপারে আলোচনা করেছি ঢাকা'র ট্রাফিক জ্যাম নিরসনে চারটি পদক্ষেপ। পদক্ষেপগুলি হল বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বা বিআরটি, পুলিশ টিকেট ব্যবস্থা এবং কার পুল, আধুনিক বাস টার্মিনাল এবং ভার্চুয়্যাল অফিস। এখানে উল্লেখ্য, বিআরটি ব্যবস্থাটি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেশের বাস নির্মাণ শিল্পের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে **আইএফডি প্রস্তাবিত বিআরটি মডেল** আলোচনা করেছি যা বাস্তবায়িত হলে দেশের অটোমোবাইল নির্মাণ শিল্পে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সাবেক অর্থমন্ত্রী মরহুম সাইফুর রহমানের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা আমাদের দ্বিতীয় স্পেশাল আর্টিকেলটি প্রকাশ করি '**একজন সাইফুর রহমান**' শিরোনামে ২০১০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর। এই আর্টিকেলটি রচনা করতে গিয়ে আমরা মরহুম সাইফুর রহমানের আত্মজীবনী '**কিছু কথা কিছু স্মৃতি**' থেকে নির্বাচিত অংশ তুলে ধরেছি এবং সেইসাথে তার চরিত্রের নানা দিক নিয়ে আমরা আমাদের নিজস্ব কিছু ভাবনা তুলে ধরেছি।

তার লেখা আত্মজীবনী পড়ে তার মনের যে বেদনা আমরা উপলব্ধি করেছি, তাই মূলত আমরা তুলে ধরেছি নিজস্ব ভাষায়। তাই পাঠকদেরকে অনুরোধ করব এই আর্টিকেলটি পড়ার পাশাপাশি মরহুম সাইফুর রহমানের আত্মজীবনীটিও একই সাথে পড়ার জন্য। না হলে এই আর্টিকেলের মূল উদ্দেশ্য বোঝা যাবে না।

তার নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত নেয়ার দক্ষতা বোঝাতে গিয়ে আমরা এই রচনার সাথে আরো দুটি অপ্রকাশিত পেপার Supplementary Article হিসাবে প্রকাশ করেছি। এর মধ্যে একটি হল বাংলায় যার শিরোনাম '**প্রসঙ্গঃ সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ**', এবং দ্বিতীয়টি ইংরেজিতে যার শিরোনাম The Decision on Central Bonded Warehouse: Is It Wise?

এরপর ২০১১ সালের ১৭ জানুয়ারী তারিখে আমরা প্রকাশ করেছি আরো একটি স্পেশাল আর্টিকেল যার শিরোনাম '**মেগা প্রকল্পের যৌক্তিকতা**' যেখানে আমরা আলোচনা করেছি সরকার গৃহীত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিটি – এই তিনটি মেগা প্রকল্পের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান। আমরা এই আর্টিকেলে যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি বর্তমান পরিস্থিতিতে এই তিনটি মেগা প্রকল্পের বাস্তবায়নে দেশের খুব একটা লাভ হবে না।

সর্বশেষ ২০১১ সালের ১৪ এপ্রিল বৈশাখের প্রথম দিনে আমরা প্রকাশ করি আমাদের দ্বিতীয় পলিসি পেপার '**আবারো ডলার স্টোর**'। এই পেপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমেরিকার ক্রমবর্ধমান ডলার স্টোর শিল্পে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনা। বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনা এবং রপ্তানি করার কৌশল আলোচনা করার পাশাপাশি আমরা এই পেপারে আলোচনা করেছি **রিটেইল সেক্টর ট্রেডিং মডেল** যার বাস্তবায়নের মাধ্যমে খুব দ্রুত বাংলাদেশের রপ্তানিকে বহুমুখী করা সম্ভব।

নিচের সেকশনগুলিতে আমরা এই পেপারগুলির নির্বাচিত কিছু অংশ তুলে ধরছি। এর ফলে পাঠকরা বুঝতে পারবেন, বিগত দুই বছরে আমাদের করা বিভিন্ন মন্তব্য বর্তমান সময়ের বিবেচনায় কতটুকু প্রাসঙ্গিক।

দুর্নীতির ব্যাপকতা এবং প্রভাব

দুর্নীতির ব্যাপকতা মানুষের জীবনে কিভাবে প্রভাব ফেলে, তা বোঝাতে গিয়ে **অবয়বহীন দুর্নীতি** শীর্ষক পেপারের ৩১ পৃষ্ঠায় আজ থেকে দুই বছর আগে আমরা লিখেছি,

'.....আমরা যদি দুর্নীতির একটু গভীরে যাই, তাহলেই দেখতে পাব, আমাদের চারপাশের সকল সমস্যার মূলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত রয়েছে কোন না কোন প্রকারের দুর্নীতি। এই সকল সমস্যা প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনে প্রভাব ফেলছে.....আমাদের সড়কগুলিতে যখন দুর্ঘটনা হয়ে মানুষ মারা যায়, তখন তদন্ত করে হয়তো পাওয়া যায় আসলে সেই গাড়ির ড্রাইভারটির কোন বৈধ লাইসেন্স ছিল না। এই অবৈধ লাইসেন্স সে আবার পেয়েছিল সংশিষ্ট বিভাগকে ঘুষ দিয়ে। তাই এই জীবনহানির জন্য এই ছোট্ট দুর্নীতিই অনেকাংশে দায়ী। কিন্তু আমরা কখনো বিষয়টিকে এভাবে দেখি না।

একই কথা প্রযোজ্য অন্য যে কোন দুর্ঘটনার বেলাতেও। লঞ্চ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী যেমন লঞ্চের এুটিপূর্ণ কাঠামো যা কিনা আবার ঘুষ দিয়ে পাশ করিয়ে আনা হয়েছে, তেমনি বাড়ি ধ্বসে পড়লে কিংবা ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগলেও দেখা যাবে এর জন্য মালিক পক্ষের সাথে সরকারি বিভাগের অবৈধ আতাতই মুলত দায়ী।

তাই আমরা যদি আমাদের মা-বাবা, ভাই-বোন, এবং আত্মীয়-স্বজনদের এই ধরণের অপমৃত্যু এড়াতে চাই, নিজেদের জীবনকে যদি দুর্ভোগমুক্ত করতে চাই, তাহলে দুর্নীতির বিপক্ষে না যাওয়া ছাড়া আসলে আমাদের আর কোন উপায় নেই।'

পাঠকরা নিশ্চয়ই দুই বছর আগে আমাদের করা এই মন্তব্যগুলির সাথে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর অনেক মিল খুঁজে পাবেন।

রুটিন কাজ এবং দুর্নীতি

সরকারের রুটিন কাজ করার ব্যর্থতার সাথে দুর্নীতির সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে আমরা '**ঢাকা নগরীর যানজট নিরসনে আইএফডি'র প্রস্তাবনা**' শীর্ষক পলিসি পেপারের ১৭৮ পৃষ্ঠায় লিখেছি,

'এখানে সরকারকে খেয়াল রাখতে হবে যে ঢাকা শহরের ট্রাফিক জ্যাম সারা বাংলাদেশের হাজারো সমস্যার মধ্যে একটি মাএ সমস্যা। তাই এই সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবস্থা নিতে গিয়ে অন্যান্য সমস্যার দিকে নজর হারালে একটি সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আমরা অন্যান্য সমস্যাগুলিকে বাড়িয়ে তুলব। এই ধরণের প্রবণতা দেখা গেছে অতীতে।

এর একটি অন্যতম প্রধান কারণ বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেন্দ্রীভুত এবং সকলেই সেই কেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকেন একটি সিদ্ধান্ত বা দিকনির্দেশনার জন্য। ফলে সেই দিক নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত অধিকাংশ কাজই থেমে থাকে.....বর্তমানে ঢাকা শহরের ট্রাফিক জ্যামের যে এই বেহাল অবস্থা, এর কারণ অতীতে নির্বাচনকালীন সময়ে এই বিষয়টি নিয়ে কোন ইস্যু সৃষ্টি হয়নি। ফলে কোন রাজনৈতিক দল এই সমস্যা সমাধানের কোন শক্ত প্রতিশ্রুতি দেয়নি যদিও বর্তমান সরকারি দলের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে এই বিষয়ের উল্লেখ ছিল। তাই একটি মহাপরিকল্পনা থাকা সত্বেও তার বাস্তবায়নে কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। তাই আমাদের সর্বশেষ প্রস্তাবনাটি হলঃ

প্রস্তাবনা ২০ঃ ঢাকা শহরের ট্রাফিক জ্যামের সমাধান করতে গিয়ে সরকার যেন অন্যান্য সমস্যাকে ভুলে না যায়। মনে রাখতে হবে ঢাকা শহরের ট্রাফিক জ্যাম সারা বাংলাদেশের অসংখ্য সমস্যার মধ্যে একটি সমস্যা মাত্র।

প্রস্তাবনা ২১ঃ সরকারি বিভাগগুলিতে ক্ষমতার যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে যাতে কোন কাজই আটকে না থাকে। প্রতিটি কাজ সঠিক সময়ে করার জন্য সর্বস্তরে দুর্নীতি কমানোর কোন বিকল্প নেই।'

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা শহরের যানজট নিয়ে প্রচুর আলোচনা-লেখালেখি হচ্ছে। সরকারও বিভিন্ন স্থানে ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে যানজট সমস্যা সমাধান করতে চাচ্ছে। কিন্তু সরকার ইতিমধ্যে ভুলে গেছে আন্তঃজেলা মহাসড়কগুলোর সংস্কার কাজের কথা। অথচ এই কাজটি একটি রুটিন কাজ, এবং দশকের পর দশক ধরে এই কাজটি সংশ্লিষ্ট বিভাগ সময়মত করে আসছিল। কিন্তু বর্তমানে এই রুটিন কাজটিই সরকার করতে পারেনি। ফলে দেখা গেছে বিগত ঈদে ঘরমুখো যাত্রীদের সীমাহীন বিড়ম্বনা।

মৃত্যুদন্ডের বিধান

মৃত্যুদন্ডের বিধান সম্পর্কে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার করতে গিয়ে **'বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড, মৃত্যুদন্ডের বিধান এবং কিছু কথা'** শীর্ষক স্পেশাল আর্টিকেলে আমরা বলেছি,

'.....কর্ণেল ফারুক-রশিদরা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর সবসময়ই ক্ষমতাধরদের আনুকূল্য পেয়ে এসেছেন। কিন্তু পরিস্থিতি বদলে যায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসাতে। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ এই বিচার প্রক্রিয়া শুরু করে। কিন্তু পরবর্তীতে বিএনপি ক্ষমতায় আসাতে বিচার প্রক্রিয়া আবারো ঝুলে যায়।

২০০৯ সালে যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না আসত, তাহলে আমরা এই বিচার আর চোখে দেখতাম না। কারণ বিএনপি ক্ষমতায় এলে কর্ণেল ফারুক-রশিদরা যে বিচার প্রক্রিয়াকে আবারো রুদ্ধ করে দিতেন, এটা নিশ্চয়ই দেশের শিশুও বোঝে। এই বিচার রুদ্ধ করার একটাই কারণ। এই বিচার সুষ্ঠুভাবে হলে তার রায় যে মৃত্যুদন্ডই হবে, সেটা সকলেই জানতেন।

বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সুশাসনের ঘাটতি থাকাতে ক্ষমতাধররা সবসময়ই হত্যাকান্ড ঘটিয়ে পার পেয়ে গেছেন। এটা অতীতে হয়েছে। ভবিষ্যতেও হবে।

এখানে বলা দরকার মানব সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে হত্যাকান্ড ঘটেছে। মানুষ মানুষকে হত্যা করে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে। হিংসার বশে, ক্রোধের বশে, কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে। এই প্রবণতা কখনোই রোধ করা যাবে না। যে সকল দেশে বিচার ব্যবস্থা খুব উন্নত, সেই সকল দেশেও হত্যাকান্ড প্রতিনিয়তই ঘটছে। এই ধারাকে শূন্যে নামিয়ে আনা তাত্বিকভাবে সম্ভব হলেও বাস্তবে কখনো সম্ভব নয়।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলির ভিতরে এই ধরণের অবিচার কতটুকু হয়, তা আমার জানা নেই। তবে আন্তর্জাতিক পরিসরে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের মাধ্যমে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েও তাদের মুল হোতাদের কোন প্রকারের বিচারের আওতায় এখনো আনা যায়নি, এই ধরণের দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে।

তাই হত্যার বদলা একমাএ মৃত্যুদন্ডের মাধ্যমেই নিতে হবে – এই আইনকে যদি পরিবর্তন না করা হয়, তাহলে বাংলাদেশের মত সুশাসনহীন দেশে ক্ষমতাধররা হত্যা করে পুরো বিচার প্রক্রিয়াই স্তব্ধ করে রেখে দিবেন। তাই যিনি অত্যাচারিত, তিনি দ্বারে দ্বারে বিচারের জন্য ঘুরে বেড়াবেন। অথচ কোন প্রকার বিচার তিনি পাবেন না। এর কারণ যিনি হত্যাকারী, তিনি এই সুন্দর পৃথিবীতে বাঁচতে চান। তিনি জানেন এই হত্যাকান্ডের বিচার হলে তার মৃত্যু নিশ্চিত। তাই তিনি সর্বশক্তি দিয়ে এই বিচার প্রক্রিয়া রুদ্ধ করার চেষ্টা করবেন শুধুমাএ এই সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য।

অনেকে আমাকে বলবেন, আমাদের দেশে যখন চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি, দুর্নীতি ইত্যাদিও বিচার হচ্ছে না, তখন হত্যার আইন পরিবর্তন করার তো কোন মানে নেই। এই আইন থাকলেও যা, না থাকলেও তা।

হ্যা। এই কথা ঠিক।

কিন্তু এরপরও আমি বলব, হত্যার একমাএ শাস্তি মৃত্যুদন্ড – এই আইনের মধ্যে আমরা যদি পরিবর্তন আনতে পারি, তাহলে সমাজের সবচেয়ে বড় অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া পুরোপুরি রুদ্ধ না হওয়ার সম্ভাবনাটিকে আমরা কিছুটা হলেও বাড়াতে পারি।'

অতি সম্প্রতি মহামান্য রাষ্ট্রপতি একজন আওয়ামী লীগপন্থী সন্ত্রাসী এবং খুনের আসামিকে ক্ষমা করে দেয়াতে সর্বত্রই সমালোচনার ঢেউ উঠে। সবাই বলতে থাকেন, এই ধরণের এক দাগী এবং দুর্ধর্ষ খুনিকে তিনি কি করে ক্ষমা করলেন?

এই খুনি যদি একজন ভাল মানুষ হত, সমাজে যদি তার সুনাম থাকতো, সে যদি টিভি'র টকশোগুলোতে নিয়মিত অংশ নিত, তাহলে এই ধরণের ক্ষমা করে রাষ্ট্রপতি বরং আরো সকলের প্রশংসা পেতেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল, যারা খুন করে, যাদের ফাঁসি হয়, তারা কি কখনো ভাল মানুষ হয় কিনা? তারা তো গুন্ডা-বদমাশই হবে। তাই এই ধরণের আশা করে তো লাভ নেই।

তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সমালোচনার একটি কারণ হল তিনি বার বার শুধুমাত্র আওয়ামী লীগপন্থী গুন্ডাদেরকেই ক্ষমা করছেন। তার ক্ষমার স্বাদ পাচ্ছে না বিএনপিপন্থী, জামায়াতপন্থী কিংবা কোন প্রকার পন্থাহীন গুন্ডারা।

এই পরিস্থিতিতে আমরা মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এই জন্য যে তিনি অন্তত প্রমাণ করেছেন খুনের দায়ে দন্ডিত ফাঁসির আসামিকেও ক্ষমা করা সম্ভব। তবে ভবিষ্যতে তার এই ক্ষমার আনুকুল্য যেন অন্যান্য সকল গুন্ডারাও পায়, আমরা সেই আবেদনই জানাবো।

তবে এখানে আমাদের অবস্থান হল, হত্যাকান্ডের শাস্তি হিসাবে ফাঁসির দন্ডের পাশাপাশি হত্যার আসামীকে ক্ষমা করার বিধানও থাকা প্রয়োজন এবং এই ক্ষমা করার এখতিয়ার মহামান্য রাষ্ট্রপতি ছাড়াও নিহত ব্যক্তির পরিবারদেরও থাকা উচিত, এবং তা হওয়া উচিত উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে।

ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে ফাঁসির আসামিকে ক্ষমা করার এই প্রস্তাবের বিস্তারিত নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করতে চাইনা। তবে এই মৌলিক নীতি যদি জনসমর্থন পায়, তাহলে ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আমরা আরো বিস্তারিত লেখার আশা রাখি।

এখানে বলা দরকার, পবিএ কোরআনে হত্যার বদলে হত্যার দিকনির্দেশনা যেমন রয়েছে, তেমনি ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়ার দিকনির্দেশনাও রয়েছে।

আমার এই বক্তব্য শুনে যারা ধর্মের এলার্জিতে ভুগেন তারা আশা করি চিৎকার করে উঠবেন। তারা বলবেন, আমি আসলে দেশে শরীয়া আইন চালুর প্রস্তাব করছি।

তারা যদি সত্যিই সত্যিই এই কথা বলেন, তাহলে আমরা বলব একটি আইন শরীয়া কি নন-শরীয়া, তা বিবেচ্য বিষয় নয়। দেখতে হবে সেই আইনটি আমাদের প্রয়োজন মেটাচ্ছে কিনা।

এখানে উল্লেখ্য, হত্যা শুধু গুন্ডা-বদমাশরা করেনা, পুলিশ, র‍্যাব এবং আর্মির মত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও করে। কিন্তু তারা যেহেতু সরকারি লোক, সেহেতু অনেক সময় এই সংবাদগুলো মানুষের সামনে যেমন আসে না, তেমনি সামনে আসলেও তার কোন বিচার হয় না। কারণ যত যাই বলুন, সরকার কিন্তু সবসময়ই তার বাহিনীকে প্রটেকশন দিয়ে যাবে। এই প্রটেকশন যদি সরকার না দেয়, তাহলে এই বাহিনীর সদস্যরা আর মাঠে নামতে চাইবেন না। কারণ, এই বাহিনীর সদস্যরা যখন চোর-ডাকাত-গুন্ডা-বদমাশ ধরতে যান, তখন তারা খুব ভাল করেই জানেন এই অভিযানে তাদের জীবনের ঝুঁকি আছে।

তাই অভিযানের সময় গুলি করার আগে তারা যদি আইএফডি'র মত চিন্তা করতে থাকেন কে পথচারী, আর কে গুন্ডা, তাহলে তার নিজের জীবননাশেরই সম্ভাবনা আছে।

তবে উন্নত দেশগুলিতে এই ধরণের অনিচ্ছাকৃত হত্যা যাতে কম থাকে, তার জন্য অনেক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উচিত এই ধরণের প্রশিক্ষণ নেয়া যাতে ভবিষ্যতে অহেতুক হত্যাকান্ড যতদুর সম্ভব কমানো যায়।

এখানে বলা দরকার, এই ধরণের আইন কোন ম্যাজিক ফর্মুলা নয় যে শুধুমাএ এর মাধ্যমেই সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। সামগ্রিক ন্যায়বিচার পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য এই

ধরণের আইন করার পাশাপাশি সমাজ থেকে দুর্নীতি যেমন নির্মূল করতে হবে, পরিকল্পিত নগরায়ন করে জীবনমান যেমন উন্নত করতে হবে, তেমনি দেশের রপ্তানি বাড়িয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের গতিও বাড়াতে হবে। তা না হলে কিন্তু সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে না।

আমরা কিন্তু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সকল ফর্মুলা নিয়েই বিগত দুই বছর ধরে একে একে আলোচনা করছি। যারা আমাদের নিয়মিত পাঠক, তারা নিশ্চয়ই এই কথা স্বীকার করবেন।

ধর্মের পক্ষে অবস্থান

সমাজ থেকে দুর্নীতি নির্মূলের জন্য জনসাধারণের নৈতিকতা বৃদ্ধির বিকল্প কিছু নেই, আর ধর্মের আলোচনাবিহীন নৈতিকতা বৃদ্ধির যে কোন পদক্ষেপ ব্যর্থ হতে বাধ্য কারণ ধর্মই হল নৈতিকতার মূল সূত্র। এই প্রেক্ষিতে **'অবয়বহীন দুর্নীতি'** শীর্ষক পেপারের ১২৭ পৃষ্ঠায় আমরা বলেছি,

'সমাজের সকলের মধ্যে নৈতিকার উন্নয়ন কি করে ঘটানো যায়, তা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হতে পারে। এর জন্য নিয়োগ করা যেতে পারে বিদেশী কনসালটেন্ট, গ্রহণ করা যেতে পারে হাজার কোটি টাকার নতুন নতুন প্রকল্প।

তবে আমার মতে, আমরা যদি সকলের মাঝে ধর্মের প্রতি বিশ্বাস বাড়াতে পারি, তাহলেই অতি দ্রুত সমাজের সকলের মধ্যে নৈতিকতার উন্নয়ন সম্ভব।

বিশ্বের প্রতিটি ধর্মই সততার জয়গান গায়, অসততা এবং অপরাধ প্রবণতাকে তিরস্কার করে। তাই ধর্মের প্রতি মানুষের বিশ্বাস বাড়ানো গেলে মানুষ নিজেই নিজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। এর জন্য বাইরের কোন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন পড়বে না।

আমরা যদি সকলের মাঝে এই বিশ্বাসটি ঢুকিয়ে দিতে পারি যে এক আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাদের সকল কর্মকান্ডের উপর চোখ রাখছেন, এবং মৃত্যুর পর আমাদের সবাইকে তার কাছে ফিরে গিয়ে সবকিছুর জন্য জবাবদিহি করতে হবে, তাহলে মানুষের মনে প্রতিটি কাজের বেলায় আল্লাহভীতি কাজ করবে। এবং এই আল্লাহভীতির কারণেই মানুষ সকল প্রকার দুর্নীতি থেকে দুরে থাকবে।

সমাজে নৈতিকতা উন্নয়নের বিষয়ে যখনই কোন আলোচনা করা হয়, তখনই ধর্মের গুরুত্বের কথা হালকাভাবে উচ্চারণ করা হয়, কিন্তু কখনোই এই বিষয়টির উপর জোর দেয়া হয় না। এর কারণ আমরা সবাই মিলে ধর্মকে একটি সংবেদনশীল বিষয় বানিয়ে ফেলেছি এবং দেশের নীতি ধর্মের পক্ষে থাকবে নাকি বিপক্ষে থাকবে, সেই ব্যাপারে কোন প্রকার ঐকমত্যে আমরা এখনো পৌঁছাতে পারিনি।

নৈতিকতা বৃদ্ধির আলোচনা অনুষ্ঠানে যদি ধর্মের গুরুত্বের কথা বিষদভাবে আলোচিত না হয়, তাহলে ধর্মকে এড়িয়ে নৈতিকতা বৃদ্ধির এই আলোচনা বাস্তবে কতটুকু ফলপ্রসু হবে, সেই ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যায়। কারণ, সততার কথা যদি বলা হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসবে, মানুষ কেন সৎ থাকবে ? তার সৎ থাকার প্রয়োজন কি ?

এর উত্তর কিন্তু ধর্মগ্রন্থতেই রয়েছে। এর উত্তর হল মানুষের সৎ থাকার প্রয়োজন রয়েছে কারণ সৎ থাকলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন এবং তিনি সন্তুষ্ট হলে মৃত্যুর পর বেহেশত পাওয়া যাবে যা হবে চূড়ান্ত সফলতা। তাই এই উত্তর যদি জোর গলায় বলা না হয়, তাহলে নৈতিকতা বৃদ্ধির যে কোন পদক্ষেপ ব্যর্থ হতে বাধ্য।'

আমরা পেপারটির পরবর্তী অংশে সবাইকে ধর্মের পক্ষে অবস্থান নেয়ার জন্য আমাদের যুক্তি উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরেছি। এখানে বলা দরকার, দেশের অনেক মুক্তবুদ্ধির ব্যক্তিবর্গের মত আমরাও নিজেদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অনুসারী মনে করি, নিজেদেরকে অসাম্প্রদায়িকও[১] মনে করি। তবে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ নই। এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে আমরা বুঝি, **রাষ্ট্র এবং ধর্ম আলাদা, ধর্ম শুধু ব্যক্তির বিষয়, এই বিষয়ে রাষ্ট্রের কোন দায়দায়িত্ব নেই।** এটাই বিশ্বব্যাপী 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র সবচেয়ে জনপ্রিয় সংজ্ঞা।

এখানেই আমাদের আপত্তি। আমরা মনে করি, রাষ্ট্রের ধর্মসংক্রান্ত কিছু না কিছু দায়দায়িত্ব আছে। এই দায়দায়িত্বের সীমানা কতটুকু, কোথায় গিয়ে এই সীমানা শেষ হয়েছে, তার কোন সংজ্ঞা নেই। কিন্তু রাষ্ট্র এই দায়িত্ব কখনোই এড়াতে পারে না।

[১] 'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দটির অর্থ হল সম্প্রদায়গত বৈষম্যমূলক আচরণ। সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হতে পারে ধর্মের ভিন্নতার কারণে, ধনের বৈষম্যের কারণে, শরীরের চামড়ার রঙের ভিন্নতার কারণে, ভৌগোলিক অবস্থানের ভিন্নতা বা জাতীয়তাবোধের কারণে, রাজনৈতিক মতবাদের ভিন্নতার কারণে, পেশাগত বিভেদের কারণে, এবং মানুষে মানুষে আরো নানা বিভেদের কারণে। কিন্তু বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা বলতে কেন জানি শুধুমাত্র ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকেই বার বার হাইলাইট করা হয়। অন্যান্য বৈষম্যও যে সাম্প্রদায়িকতা, তা নিয়ে কখনোই কোন আলোচনা করা হয় না।

বিগত দিনগুলিতে বিভিন্ন মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে নানাভাবে জনমত সৃষ্টির প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এই সকল বক্তব্য-বিবৃতি পড়ে আমাদের কাছে মনে হয়েছে, বাংলাদেশের একটি শ্রেণীর মধ্যে ধর্মের প্রতি অহেতুক এলার্জি যেমন রয়েছে, তেমনি একই শ্রেণীর মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কেও সচেতনতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

প্রকৌশলশাস্ত্র, ডাক্তারিশাস্ত্র, এবং অর্থনীতিশাস্ত্রের মত ধর্মশাস্ত্রও একটি ডিসিপ্লিন। ধর্মশাস্ত্র স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। তবে ধর্মশাস্ত্রের সাথে অন্যান্য শাস্ত্রের পার্থক্য হল ধর্মশাস্ত্রে পারদশী হওয়ার জন্য অন্যান্য শাস্ত্রে পারদশী না হলেও চলে, তবে ধর্মশাস্ত্রের জ্ঞান ছাড়া অন্যান্য শাস্ত্রে পারদশী হওয়া যায় না কারণ নৈতিকতা জ্ঞান সর্বত্রই প্রয়োজন।

একজন অর্থনীতিবিদ যদি ভুল নীতি কৌশল প্রণয়ন করে দেশের অর্থনীতির বারোটা বাজান, তাহলে এর জন্য অর্থনীতিশাস্ত্র দায়ী নয়। এর জন্য দায়ী সেই অর্থনীতিবিদ।

একজন প্রকৌশলী যদি দুর্বল কাঠামো বানিয়ে দেশের ক্ষতি করেন, তাহলে এর জন্য দায়ী সেই প্রকৌশলী। এর জন্য প্রকৌশলশাস্ত্রকে যারা দায়ী করবে, তারা গন্ডমুর্খ ছাড়া আর কিছুই নয়।

একজন হাতুড়ে ডাক্তার যদি ভুল চিকিৎসা করে রোগী মেরে ফেলে, তাহলে এর জন্য তো ডাক্তারিশাস্ত্রকে দায়ী করে কোন লাভ নেই।

একইভাবে বলা যায়, কোন ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ যদি ধর্মের অপব্যখ্যা দিয়ে সমাজে অস্থিরতার সৃষ্টি করেন, তাহলে তো ধর্মকে দায়ী করে কোন লাভ নেই। সব দোষ তো সেই ধর্মবিশারদের।

এই কারণে সমাজে যাতে হাতুড়ে ডাক্তার, হাতুড়ে প্রকৌশলী এবং হাতুড়ে অর্থনীতিবিদ তৈরি না হয়, সেজন্য সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করে তৈরি করছে ভাল মানের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে যাতে সঠিকভাবে এই বিদ্যাগুলো পড়ানো হয়, তার জন্য নিয়মিত সিলেবাসকে আপডেট করা হচ্ছে।

তাই সরকার যদি সমাজের সর্বত্র সঠিকভাবে ধর্মশাস্ত্র পড়ানোর এবং শেখার সুযোগ সৃষ্টি করার দায়িত্ব না নেয়, সেই সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে এগিয়ে না আসে, তাহলে তো সমাজে হাতুড়ে ধর্মবিশারদের সংখ্যা বাড়বে, কমবে না।

তাই ধর্মের অপব্যবহার রোধের জন্যও রাষ্ট্রকে ধর্মের পক্ষে থাকতে হবে।

শেয়ার বাজারে দুর্নীতি

শেয়ার বাজারের দুর্নীতির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে **অবয়বহীন দুর্নীতি** শীর্ষক পেপারের ৯৯ পৃষ্ঠায় আমরা লিখেছি,

'বর্তমান বিশ্বে স্টক এক্সচেঞ্জগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্নীতির এক একটি আখড়া। এই স্টক এক্সচেঞ্জগুলোতে প্রতিদিন শত শত কোটি টাকার লেনদেন হচ্ছে। যারা এই লেনদেন করার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তারা সকলেই বিশেষায়িত দক্ষতার অধিকারী। এই সকল লেনদেনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে বিভিন্ন সংবেদনশীল তথ্য। এই তথ্যগুলো আবার সবসময় সঠিকভাবে প্রচারিত হয়না। তাই এই ধরণের সংবেদনশীল তথ্যের উপর ভিত্তি করে অনেকেই টাকার পাহাড় গড়ছেন।

আবার অনেক সময় কোন প্রকার তথ্য এবং কারণ ছাড়াই একটি শেয়ারের দাম কমে বা বাড়ে। এই ধরণের প্রবণতাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে এক বা একাধিক বৃহৎ বিনিয়োগকারীদের সিন্ডিকেট। এই সিন্ডিকেটই ঠিক করে তারা কোন শেয়ারের দাম বাড়াবে, কোনটির কমাবে। তাই এই ধরণের অসাধু সিন্ডিকেটের অপতৎপরতায় ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের টাকা চলে যায় বৃহৎ বিনিয়োগকারীদের হাতে।

বাংলাদেশের মত অনুন্নত দেশে এই ধরণের দুর্নীতির সম্ভাবনা বরং আরো বেশি। কারণ এখানকার স্টক এক্সচেঞ্জগুলোতে লেনদেনকৃত শেয়ারের পরিমাণ কম হওয়াতে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর কাছে ক্ষমতা পুঞ্জিভুত হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি। তাই এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠী চাইলেই কৃত্রিমভাবে কোন একটি শেয়ারের দাম বাড়িয়ে বা কমিয়ে বাজার থেকে কোটি কোটি টাকা তুলে নিতে পারেন।

এই ধরণের কৃত্রিম লেনদেন এবং অনিয়ম যাতে না ঘটে, তা তদারকি করার জন্য রয়েছে Security and Exchange Commission (SEC)। এই সংস্থার কর্মকর্তারা সবসময়ই দৃষ্টি রাখেন বাজারের গতি প্রকৃতির দিকে। কোন বাজার প্লেয়ার যদি অনিয়ম করেন, তাহলে তাদেরকে শাস্তি দেয়ারও এখতিয়ার রয়েছে এই সংস্থার কর্মকর্তাদের।

এম এম মডেলের মাপক অনুযায়ী এই কর্মকর্তাদের ক্ষমতা অনেক কম, কিন্তু যেহেতু একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর কোটি কোটি টাকার প্রশ্নবিদ্ধ লেনদেন ধরার ক্ষমতা তাদের রয়েছে, সেহেতু কর্মকর্তাদের ঐচ্ছিক ক্ষমতা অনেক অনেক বেশি। তাই দুর্নীতির সম্ভাবনাও বেশি।

এই সম্ভাবনা কমানোর জন্য সরকারের উচিত তাদের ক্ষমতার সাথে বেতন কাঠামো এবং জবাবদিহিতার ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করা।'

শেয়ার বাজার ধ্বস পরবর্তীতে সরকার যে তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল, তার রিপোর্টে আমাদের করা অনেক মন্তব্যেরই প্রমাণ পাওয়া যাবে।

শেয়ার বাজার ধ্বস সংক্রান্ত আইএফডি'র সাবধানবাণী

আইএফডি'র প্রথম এক্সক্লুসিভ পেপার যারা পুরোটা পড়েছেন, তারা নিশ্চয়ই জানেন যে এই পেপারের সংযুক্তিতে আমরা কালোটাকা-সাদাটাকা সংক্রান্ত একটি তত্ব আলোচনা করেছি। আমরা যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি, **একটি কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযান ছাড়া কালোটাকা সাদা করার পদক্ষেপের কোন অর্থনৈতিক গুরুত্ব নেই। তবে সমাজ থেকে দুর্নীতি নির্মুলের জন্য একটি কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযানের পাশাপাশি কালোটাকা সাদা করার সুযোগ দেয়ার বিকল্প কিছু নেই।**

এই তত্ব আলোচনা করতে গিয়ে আমরা একটি কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযানের দাবি যেমন তুলেছি, তেমনি একই সাথে বিনিয়োগের মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়ার দাবিও জানিয়েছি। এখানে বলা দরকার, আমরা পেপারটির সংযুক্তিতে এই বিষয়ে মোটা দাগে কিছু কথা বলেছি। এই নীতির প্রতি জনসমর্থন যদি গড়ে উঠে, তাহলে এই বিষয়ে আরো গভীর পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

তবে এই তত্ত্বটি নিয়ে আমরা যখন চিন্তা করছিলাম, তখন আমাদের ধারণা ছিল না যে এই তত্ত্বটিতে একটি বিরাট দুর্বলতা রয়েছে। দুর্বলতাটি হল, কালো টাকা সাদা করার জন্য জরিমানা বা তিরস্কারের বদলে যদি পুরস্কারের ঘোষণা দেয়া হয়, তাহলে কোন প্রকার দুর্নীতি দমন অভিযান ছাড়াই মানুষ কালো টাকা সাদা করবে।

এই দুর্বলতা আমরা হঠাৎ করেই ধরতে পারি ২০০৯ সালের বাজেট পেশের পর।

২০০৯ সালের বাজেটে সরকার বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিলেও এর পাশাপাশি পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের মাধ্যমেও কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিয়েছিল।

আমি সাধারণত বাজেট বক্তৃতা মন দিয়ে পড়ি না। তাই স্বভাবতই সরকারের এই ঘোষণা আমি খেয়াল করিনি। তবে কিছুদিন পর শেয়ার বাজার সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট পড়তে গিয়ে আমি হঠাৎ আবিষ্কার করি, সরকার পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিয়েছে।

এই আবিষ্কার করে আমি রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে যাই। সরকার করেছেটা কি? এটা তো কালো টাকার মালিকদেরকে পুরস্কৃত করার শামিল! তাহলে তো মানুষ এমনিতেই কালো টাকা সাদা করবে। সেই সাথে পুঁজিবাজারও স্ফীত হবে। একসময় সেই কৃত্রিম পুঁজিবাজারে ধ্বস নামবে।

আইএফডি তখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। **অবয়বহীন দুর্নীতি** শীর্ষক পেপারটি নিয়ে আমি তখনো ঘষামাজা করছিলাম। তাই আমি ঠিক করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী এএমএ মুহিতকে এই ব্যাপারে সাবধান করে আমাকে একটি চিঠি লিখতে হবে।

এই দুটি চিঠি আমি পাঠিয়েছিলাম ২০০৯ সালের জুলাই মাসের শুরুতে। আইএফডি প্রতিষ্ঠার তখনো প্রায় এক মাস বাকি।

এটাই ছিল বাংলাদেশ সরকারকে দেয়া আইএফডি'র প্রথম পরামর্শ। আমি এই চিঠিটির একটি কপি আজ সংযুক্তি হিসাবে আর্টিকেলের শেষে প্রকাশ করছি।

ইংরেজিতে লেখা চিঠিটির একটি অংশে আমি বলেছি,

'.....such a provision would in fact reward the black money holders through capital gains instead of punishing them through a 10% levy. I believe the stock market in Bangladesh is controlled by a syndicate of large investors who decide in advance the movement of share prices. Therefore, if provision for whitening black money through shares of listed companies is given, they will invest their black money in the stocks and raise the market intentionally. Eventually, a point will come when the market will be overheated, and plunge all on a sudden as it was the case during the past Awami League regime.'

তবে এই চিঠি পেয়েই সরকার তার নীতি বদলে ফেলবে, তা আমি কখনোই আশা করিনি। সরকার চলে তার নিজের তালে। বাইরের পরামর্শ সরকার সাধারণত নিতে চায় না। তাছাড়া এই চিঠি সঠিকভাবে পৌঁছাবে কিনা, পৌঁছালেও মাননীয় মন্ত্রীবর্গ আমার কথাতে কান দেবেন কিনা, সেই ব্যাপারেও আমি সন্দিহান ছিলাম। কারণ তারা তো আমাকে চেনেন না।

তাই আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমি এই সর্ম্পকে আমার বক্তব্য প্রথম এক্সক্লুসিভ পেপারে যুক্ত করব এবং এই বক্তব্য সকলের সাথে শেয়ার করব যাতে এই বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা যায়। তাই **অবয়বহীন দুর্নীতি** পেপারের ১৬০ পৃষ্ঠাতে আমরা বলেছি,

'একটি কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযান ছাড়া কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়ার কোন অর্থনৈতিক গুরুত্ব নেই – এই তত্ত্বটির একটি দুর্বলতা রয়েছে। এই তত্ত্বে ধরে নেয়া হয়েছে যে সরকার এমন কোন প্রস্তাব দেবে না যাতে কালো টাকার মালিকরা তিরস্কৃত না হয়ে উল্টো পুরস্কৃত হবেন।

সরকার যদি কালো টাকার মালিকদেরকে জরিমানার মাধ্যমে তিরস্কৃত না করে উল্টো পুরস্কৃত করার কোন প্রস্তাব দেয়, তাহলে কোন প্রকার দুর্নীতি দমন অভিযান ছাড়াই মানুষ কালো টাকা সাদা করবে। যেমন সরকার যদি ঘোষণা দেয় যারা ১০% করের বিনিময়ে কালো টাকা সাদা করবে, তাদেরকে পরবর্তীতে ডেকে ডেকে মন্ত্রী বানানো হবে, কিংবা রাস্তার মোড়ে মোড়ে সরকারি খরচে তাদের মূর্তি বসানো হবে, অথবা তাদেরকে সিআইপি স্ট্যাটাস দিয়ে বছর বছর

পুরস্কৃত করা হবে, তাহলে কোন প্রকার ভীতি ছাড়াই মানুষ কালো টাকা সাদা করবে। এর জন্য কোন কার্যকরী দুর্নীতি দমন অভিযানের প্রয়োজন নেই।

এই ধরণের একটি পরিস্থিতি হাস্যকর হলেও বাংলাদেশের বাস্তবতায় তা মোটেই হাস্যকর নয়। বরং সাম্প্রতিককালে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে এমন প্রস্তাব দেয়া হয়েছে যাতে কালো টাকার মালিকরা তিরস্কৃত না হয়ে বরং পুরস্কৃত হবেন।

যেমন, এফবিসিসিআই'এর পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছিল সরকার যেন কালো টাকা সাদা করার জন্য বন্ড ছাড়ার ঘোষণা দেয়। বন্ড সঞ্চয়পত্রেরই আরেক নাম যাতে বছর বছর নির্দিষ্ট হারে সুদ দেয়া হয়। তাই কালো টাকার মালিকরা যদি ১০% জরিমানা দিয়ে কালো টাকা সাদা করে সেই টাকার বিনিময়ে সরকারের কাছ থেকে আবার বছর বছর ৮% হারে ঝুকিমুক্ত সুদ পেতে থাকেন, তাহলে সেই ১০% জরিমানার তো কোন অর্থ হল না। কারণ এই ক্ষেত্রে কার্যকর জরিমানা বা Effective Penalty হবে মাত্র ২%।

একইভাবে সরকার পুঁজিবাজারে ইতিমধ্যেই নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করার যে সুযোগ দিয়েছে, তাতেও কালো টাকার মালিকরা তিরস্কৃত না হয়ে প্রকারান্তরে পুরস্কৃত হতে পারেন। পুঁজিবাজারে যে সকল প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই নিবন্ধিত হয়ে গেছে, সেই সকল কোম্পানির শেয়ার কিনলে নতুন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে না। কোন নতুন কর্মসংস্থানও হয় না। তাই এই খাতে কালো টাকা সাদা করতে দিলে পুঁজিবাজারে অহেতুক টাকার সরবরাহ বাড়বে। ফলে কৃত্রিমভাবে শেয়ারবাজার চাঙ্গা হবে। ফলে একটা সময় আসবে যখন এই কৃত্রিম শেয়ার বাজারে ধ্বস নামবে।'

আমরা এই বক্তব্য সম্বলিত পেপার ২০০৯ সালের ১৩ আগস্ট প্রকাশ করি এবং এই বিষয়ে যাতে জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়, সেজন্য ইমেইলের মাধ্যমে প্রায় শতাধিক ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে এই পেপারের একটি কপি আমরা পাঠাই। এই বিশাল লিস্টের মধ্যে দেশের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদ থেকে শুরু করে, রাজনীতিবিদ, মন্ত্রীবর্গ, বিশিষ্ট সাংবাদিক, কলামিস্ট, বুদ্ধিজীবী, শীর্ষস্থানীয় পৃন্ট এবং ইলেকট্রোনিক মিডিয়া সকলেই রয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস এদের অনেকেই আমাদের পেপারটি পুরোটা পড়েছিলেন এবং এই সাবধানবাণী সম্পর্কে তারা অবহিত ছিলেন।

আমরা আশা করেছিলাম, সকলের কাছে এই পেপারটি পাঠালে এই সাবধানবাণী সকলেই পড়বেন, এবং এর ফলে এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠবে। ফলে সরকার বাধ্য হবে একসময় এই আদেশ পরিবর্তন করতে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সরকার এবং সরকারের বাইরের কেউই আমাদের এই সাবধানবাণীকে আমলে নেননি। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। অতিরিক্ত কালো টাকার প্রবাহে শেয়ার বাজার কৃত্রিমভাবে ফুলে ফেঁপে উঠেছে এবং এই কৃত্রিম শেয়ার বাজার একসময় হঠাৎ করে ধ্বসে পড়েছে।

সরকার যখন এই আদেশ পরিবর্তন করে, ততদিনে প্রায় এক বছর পার হয়ে গেছে। শেয়ার বাজারের সূচকও উপরে উঠে গেছে[২]। কিন্তু ততদিনে দেরি হয়ে গেছে অনেক।

অতি সম্প্রতি সরকার আবারো একই আদেশ জারি করেছিল। আমরা এতে অবাক হলেও আতঙ্কিত হইনি। কারণ শেয়ার বাজার এমন এক যায়গা যেখানে বিনিয়োগকারীরা একই ভুল অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে বার বার করবে না। তাই সরকারের এই আদেশের কারণে শেয়ার বাজারের আয়তন বাড়ার সম্ভাবনা থাকলেও তা ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের ২০১০ সালের মত এতোটা ক্ষতি করত না বলে আমরা মনে করি।

তবে ক্ষতি হোক বা না হোক, আমরা মনে করি কালো টাকার মালিকদেরকে কখনোই পুরস্কারের মাধ্যমে টাকা সাদা করতে দেয়ার সুযোগ দেয়া উচিত নয়।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, পুরস্কৃত করার পরও তো খুবই অল্প পরিমাণ কালো টাকা সাদা হয়েছে। তাহলে আমার ধারণা তো ঠিক নয়।

হ্যা। আমরাও সেটা মনে করি।

[২] ডিএসই সূত্রমতে, ২০০৯ সালের জুন মাস শেষে মোট বাজার মুলধন ছিল প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা এবং ডিএসই সাধারণ সূচক ছিল ৩০১০ এবং ২০১০ সালের জুন মাস শেষে মোট বাজার মুলধন ছিল প্রায় ২ লক্ষ ২৭ হাজার কোটি টাকা এবং ডিএসই সাধারণ সূচকের পরিমাণ ছিল ৬১৫৩। অর্থাৎ এই এক বছর সময়কালে, বাজার মুলধনের শতকরা প্রবৃদ্ধি ছিল প্রায় ১২৭% এবং সাধারণ সূচকের প্রবৃদ্ধি ছিল প্রায় ১০৪%। পূর্ববর্তী বছরগুলিতে বাজার মুলধন এবং সূচকের শতকরা প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৭.৫% এবং ০.৩৩% (২০০৮/০৯), ৯৬% এবং ৪০% (২০০৭/০৮), এবং ১২১% এবং ৬০% (২০০৬/০৭)।

আসলে বলতে কি, আমরা বরং অবাকই হয়েছি, কেন কালো টাকার মালিকরা পুরস্কার দেয়ার পরও কালো টাকা সাদা করেননি। এই বিষয়টি নিয়ে আমরা চিন্তা করেছি, এবং চিন্তা করে নিচের ব্যাখ্যাটি দাঁড় করিয়েছি।

সরকার যখন এই সুযোগ ২০০৯ সালের বাজেটে দিয়েছিল, তখন কালো টাকার মালিকরা এই সুযোগ নিতে রাজি ছিলেন। তাই তারা ব্যাপকভাবে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করেছিলেন। ফলে পুঁজিবাজারের আয়তন বেড়ে গিয়েছিল খুব দ্রুত।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই পুরস্কার কালো টাকার মালিকরা নেবেন কিনা, সেই সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সময় ছিল পুরো এক বছর। এক বছর যখন পূর্ণ হল তখন কালো টাকার মালিকরা দেখলেন যে তারা যে ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন, তা এখন ২০০ কোটি টাকায় পরিণত হয়েছে। এখন তাদের হাতে দুটি অপশনঃ

(১) তারা ১০% জরিমানা দিয়ে এই ২০০ কোটি টাকা সাদা করতে পারেন। এতে তাদের খরচ হবে ২০ কোটি টাকা। হাতে থাকবে ১৮০ কোটি সাদা টাকা।

(২) তারা কালো টাকা সাদা করবেন না। বরং এই জরিমানা না দিয়ে তারা যদি কালো টাকাই শেয়ার বাজারে রেখে দেন, তাহলে এই ২০ কোটি টাকা কিছুদিনের মধ্যে ৪০ কোটি টাকায় পরিণত হতে পারে। যেহেতু কোন প্রকার দুর্নীতি বিরোধী অভিযান এখন চলছে না, সেহেতু এই কালো টাকা নিয়ে তাদের ভীত হবারও কিছু নেই।

তথ্য উপাও বলছে অধিকাংশ কালো টাকার মালিক দ্বিতীয় অপশনটিই বেছে নিয়েছিলেন।

এখানে বলা দরকার, আমরা যখন মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই সাবধানবাণী সম্বলিত চিঠিটি পাঠাচ্ছিলাম, তখন আমাদের কাছে এই সাবধানবাণীর স্বপক্ষে কোন প্রকার গবেষণা প্রতিবেদন ছিল না। কারণ এই ধরণের পদক্ষেপ কোন সরকার এর আগে পৃথিবীর কোথাও নিয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

তাই কোন প্রকার বিশ্লেষণ ছাড়া এই ধরণের একটি সাবধানবাণী সরকারের শীর্ষমহলের কাছে পাঠানো আমাদের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কিন্তু তারপরও আমরা এই ঝুঁকি নিতে পিছপা হইনি।

দেশের সরকারের ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা এবং সরকারের বাইরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কেন আমাদের সাবধানবাণী আমলে নিলেন না, তা তারাই ভাল জানেন। তবে আমরা মনে করেছি আল্লাহপাক যেহেতু আমাদের এই বিষয়ে কিছু জ্ঞান দিয়েছেন, সেহেতু বিষয়টি সম্পর্কে সবাইকে সাবধান করা আমাদের নৈতিক এবং নাগরিক দায়িত্ব।

যে কোন প্রকার সংকটের সম্ভাবনা থাকলে সকলের উচিত সংকটের আগেই সবাইকে সাবধান করা। সংকট এসে গেলে তখন আর সাবধান করে লাভ নেই।

এখানে পাঠকরা লক্ষ্য করুন, আমরা শেয়ার বাজার ধ্বসের প্রায় দুই বছর আগেই সাবধান করেছিলাম যে শেয়ার বাজারে জুয়া খেলা হতে পারে। জুয়ার টেবিল যখন ভেঙে গেছে, জুয়াড়িরা সবাই যখন টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে, তখন তো 'জুয়া' 'জুয়া' বলে চিৎকার করার কোন মানে নেই।

লঙ্ঘিত ন্যায়বিচার

সমাজের সর্বস্তরে যাতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়, তার জন্য আমরা আমাদের পেপারগুলোর বিভিন্ন অংশে ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একাধিক মন্তব্য করেছি। বর্তমানে বাংলাদেশে ন্যায়বিচার পরিস্থিতি কেমন, তা বোধকরি একমাএ ভুক্তভোগীরাই জানেন। বিগত দুই বছরে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যাতে সাধারণ নাগরিকদের কাছে মনে হয়েছে সমাজে প্রভাবশালীরা ব্যক্তিরাও এখন আর ভোগান্তি এবং অন্যায়-অত্যাচার থেকে মুক্ত নন। আর যাদের সমাজে কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই, তাদের অবস্থা কেমন তা সহজেই অনুমেয়।

এই প্রেক্ষিতে আমরা উল্লেখ করতে চাই তুচ্ছ অভিযোগে আমার দেশ সম্পাদক মি. মাহমুদুর রহমানের গ্রেফতার এবং তার পরবর্তীতে রিমান্ডে নিয়ে তার উপর পাশবিক

নির্যাতনের বিষয়টি। এই পাশবিক অত্যাচারের বর্ণনা শুনে আমাদের কাছে মনে হয়েছে সরকার ভুলে গিয়েছিল যে তিনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি, একটি জাতীয় দৈনিকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এবং বিগত সরকারের একজন নীতিনির্ধারক ছিলেন। তার অবস্থাই যদি এমন হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ যাবে কোথায়?

সেইসাথে আমরা উল্লেখ করতে চাই বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টিও। বিগত প্রায় এক বছর ধরে ছয় জন রাজনৈতিক ব্যক্তিকে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে জেলে আটক রাখা হয়েছে, অথচ তাদের পাঁচ জনেরই বিচার প্রক্রিয়া এখনো শুরু হয়নি[৩]।

এখানে আমাদের প্রশ্ন হল, আগামীতে বিচার প্রক্রিয়া শেষে যদি এর মধ্যে তিনজনের অপরাধ প্রমাণিত না হয়, এবং তারা খালাশ পান, তাহলে এই তিনজন ব্যক্তি কোন অপরাধে এতোদিন জেল খাটলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর কি কেউ দেবেন?

এখানে বলা দরকার, সমাজে অন্যায়-অবিচার হবে, বৈষম্য হবে, ক্ষমতাধররা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করতে চাইবেন, এটাই স্বাভাবিক। এই ধরণের পরিস্থিতিতে ভুক্তভোগী মানুষের শেষ আশ্রয় হল দেশের বিচার বিভাগ। মানুষ আশা করে যে কোন অন্যায় অবিচার হলে বিচার বিভাগের কাছে গিয়ে নালিশ করলে অন্তত একটি সমাধান পাওয়া যাবে। কিন্তু বর্তমানে সেই শেষ আশ্রয়স্থলের উপর সাধারণ মানুষের আস্থা কতটুকু তা গবেষণাসাপেক্ষ।

বিচার বিভাগের উপর সাধারণ মানুষের আস্থা বাড়ানোর জন্য বিচার বিভাগের পাশাপাশি সরকারেরও অনেক দায়িত্ব রয়েছে। সরকারের কর্তাব্যক্তিরা যদি একটি বিচার শুরু হওয়ার আগেই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দায়ী করে নানা রকম জ্বালাময়ী মন্তব্য করতে থাকেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তা বিচারকদের মন মানসিকতায় প্রভাব ফেলবে।

এই ব্যাপারটি কিন্তু যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বেলায় ঘটছে। যারা এই অভিযোগে আটক হয়েছেন, তারা যেন বিচারের রায় হওয়ার আগেই যুদ্ধাপরাধী হয়ে গেছেন। বিগত

[৩] আর্টিকেলটির প্রথম সংস্করণে ভুলবশত ছয়জনের যায়গায় পাঁচজন লেখা হয়েছিল। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

বছরগুলিতে বিভিন্ন মিডিয়াতে এবং রাজনৈতিক মহল থেকে এই বিষয়ে এতোটাই প্রচার প্রচারণা চালানো হয়েছে যে, এখন আসামি পক্ষের আইনজীবী শত যুক্তি দিয়েও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জামিন আদায় করতে পারছেন না[৪]।

একটা সময় ছিল যখন বিচারকরা থাকতেন লোকচক্ষুর আড়ালে। বাইরের দুনিয়ার কার্যক্রম যাতে তাদের বিচারের রায়ে প্রভাব না ফেলে, সেই জন্য তাদের সামাজিক মেলামেশা অনেক সীমিত ছিল। তখন মিডিয়ার জয়জয়কার আজকের মত এতোটা ব্যাপক ছিল না। ফলে বিচারকদের পক্ষেও সম্ভব হত একটি নিরপেক্ষ রায় দেয়া।

কিন্তু এখন দিন পাল্টেছে। এখনকার বিচাররকরা সেমিনারে-সিম্পোজিয়ামে অংশ নেন। প্রতিদিন পত্রিকা পড়েন, টিভি দেখেন। তাই বিভিন্ন মহলের বক্তব্য-বিবৃতি এবং আস্ফালন তাদেরকে একেবারেই প্রভাবিত করবে না, এই কথাটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ভুলে গেলে চলবে না, বাংলাদেশের মত একটি সুশাসনহীন রাষ্ট্রে একজন বিচারকের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা সহজ কাজ নয়। কারণ তাদেরকেও সমাজে বাস করতে হয়, তাদের পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার দিকটি দেখতে হয়।

ন্যায়বিচার লংঘনের প্রতিটি ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা আমাদের কাজ নয়। এই ধরণের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য রয়েছে অসংখ্য পেশাদার মানবাধিকার সংগঠন, তার পাশাপাশি রয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। কিন্তু বিগত দিনে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে আমাদের কাছে মনে হয়েছে, তাদের প্রতিক্রিয়া মূলত মিডিয়া নির্ভর। মিডিয়া যে বিষয়টিকে হাইলাইট করছে, তারা যেন শুধু সেই ব্যাপারেই শুধু প্রতিক্রিয়া দেখাতে অভ্যস্ত। অন্যান্য ন্যায়বিচার লংঘনের ঘটনা যেন তাদের চোখে পড়েনা।

আমরা ভবিষ্যতে দেশের ন্যায়বিচার লঙ্ঘনের একাধিক দৃষ্টান্ত নিয়ে একটি স্পেশাল আর্টিকেল প্রকাশ করার আশা রাখি যার উপজীব্য হবে বিগত দুই বছরের ন্যায়বিচার লঙ্ঘনের কয়েকটি ঘটনা যা আমাদের মনকে নাড়া দিয়েছে।

[৪] তথ্যসূত্রঃ www.bangladeshwarcrimes.blogspot.com

শেষ কথা

বিগত দুই বছর ৩৩ দিনে আমরা আইএফডি থেকে প্রকাশিত একাধিক পেপারে জাতীয় সমস্যাগুলোর একটি সমাধান দেয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমাদের প্রস্তাবিত সমাধানগুলোই যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমাধান, এই ধরণের কোন দাবি আমরা কখনো করিনি। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের প্রত্যাশা ছিল, পেপারগুলো প্রকাশের পর বিভিন্ন মহলে আমাদের প্রস্তাবনা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হবে, এবং এর ফলশ্রুতিতে সমস্যাগুলোর একটি সেরা সমাধান বের হয়ে আসবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বলতে হচ্ছে, আমাদের প্রত্যাশা পুরোপুরি পূরণ হয়নি। বিশেষ করে দুর্নীতি দমনের একটি বিস্তারিত প্রস্তাব করার পরও আমরা এমন কোন আলোচনা-সমালোচনা শুনতে পাইনি, যার মাধ্যমে বাংলাদেশে দুর্নীতি দমনের সেরা সমাধানটির খোঁজ পাওয়া গেছে।

তবে এর মানে এই নয় যে দেশের প্রচন্ড মেধাবী সেরা কীর্তিমান গবেষকরা এই বিষয়ে চুপচাপ বসে আছেন। হতে পারে তারা এই ইস্যুতে নিরন্তর গবেষণায় ব্যস্ত এবং অচিরেই তারা তাদের প্রস্তাবিত সেরা সমাধানটি নিয়ে সর্বসমক্ষে হাজির হবেন।

আমাদের এই ধারণা যদি সঠিক হয়, তাহলে তাদের উদ্দেশ্যে আমরা দুটি কথা বলব।

প্রথমত, আমরা **অবয়বহীন দুর্নীতি** পেপারে দুর্নীতি বলতে ব্যক্তিস্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহারকে বুঝিয়েছি। এখানে ক্ষমতাকে আমরা রাষ্ট্রীয় বা সরকারি ক্ষমতা বা Public Power এবং বেসরকারি ক্ষমতা বা Private Power – এই দুই ভাগে ভাগ করিনি। এতোদিন বিভিন্ন গবেষণায় দুর্নীতি বলতে শুধুমাএ সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারকেই বোঝানো হত। কিন্তু আমরা মনে করি, দুর্নীতি শুধু সরকারি মহলেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর ব্যাপ্তি আরো অনেক ব্যাপক। তাই দুর্নীতির আদ্যোপান্ত বলতে গিয়ে আমরা দুর্নীতির একটি ব্যাপক সংজ্ঞা ব্যবহার করেছি, এবং এই ব্যাপক সংজ্ঞা ব্যবহারের কারণেই

আমাদেরকে সরকারি দুর্নীতির পাশাপাশি বেসরকারি এবং পেশাজীবীদের, এমনকি মিডিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দুর্নীতির সম্ভাবনা নিয়েও কথা বলতে হয়েছে[৫]। মিডিয়ার দুর্নীতির সম্ভাবনা নিয়ে এতোটা খোলামেলা আলোচনা এর আগে কখনো হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

দুর্নীতি একটি অপ্রিয়, সংবেদনশীল, এবং কালো সমস্যা। তাই এই সমস্যাটির সমাধান দিতে হলে এই কালো বিষয়টির সবকিছুই বলতে হবে। না হলে এই সমস্যাটির সমাধান হবে না। সমাজের সর্বত্র যেহেতু দুর্নীতি বিরাজমান, তাই সকলে খুশি হবেন এবং হাততালি দেবেন, এই ধরণের কোন মন্তব্য কিংবা বক্তব্য-বিবৃতি দিয়ে এই সমস্যাটির সমাধান করা যাবে না। আশা করি দেশসেরা কীর্তিমান গবেষকরা তাদের সেরা সমাধানটি দেয়ার আগে এই বিষয়টি খেয়াল রাখবেন।

দ্বিতীয়ত, দুর্নীতি নিয়ে আমাদের প্রথম পেপারটি প্রকাশের আগে এবং পরে বিভিন্ন মহলে কালো টাকা-সাদা টাকা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে, যদিও কালো টাকা সাদা না করে দেশ থেকে দুর্নীতি কিভাবে নির্মূল করা যাবে, সেই ব্যাপারে কাউকেই এখনো আলোকপাত করতে দেখা যায়নি। তাই দুর্নীতি নিয়ে গবেষণায় রত এই সকল মেধাবী কীর্তিমান গবেষকদের কাছে আমাদের অনুরোধ, তারা যেন দুর্নীতি নির্মূলের তৃতীয় এবং অধিকতর গ্রহনযোগ্য একটি পন্থার খোঁজ আমাদেরকে দেন যা দিয়ে আমরা কোন প্রকার বিতর্ক না ছড়িয়ে আরো সহজে সমাজ থেকে দুর্নীতি নির্মূল করতে পারি[৬]।

তবে তাদেরকে এটা বলা দরকার, এই সম্পর্কিত আলোচনাটি আমরা কিন্তু করেছিলাম পেপারের সংযুক্তিতে এবং আমাদের প্রস্তাবিত দুর্নীতি দমনের কৌশল বাস্তবায়নের একটি হাতিয়ার হিসাবে। আমাদের প্রস্তাবিত মূল সমাধানগুলো কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি পেপারের মূল অংশে।

[৫] এখানে উল্লেখ্য, অতি সম্প্রতি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) তাদের ২০১০ সালের খানা জরিপে দুর্নীতির এই ব্যাপক সংজ্ঞাকে ব্যবহার করেছে। অতীতে টিআইবি দুর্নীতি বলতে শুধুমাত্র সরকারি দুর্নীতির উপরই আলোকপাত করত। আমাদের প্রস্তাবনার প্রতি টিআইবি'র এই সমর্থনকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

[৬] অতি সম্প্রতি, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমিতির খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদরা কালো টাকা সাদা করার ব্যাপারে আমাদের প্রস্তাবনাটির সাথে একমত হয়েছেন (তথ্যসূত্রঃ দি ডেইলি স্টার)। তাই তাদেরকে আইএফডি'র পক্ষ থেকে প্রাণঢালা অভিনন্দন।

অথচ আমাদের প্রস্তাবিত দুর্নীতি দমনের মূল সমাধানগুলো কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে, কিংবা এর চেয়েও উন্নত অন্য কোন সমাধান আছে কিনা, সেই ব্যাপারে কিন্তু আমরা অন্ধকারেই রয়েছি। অন্তত প্রিন্ট মিডিয়াতে এই বিষয়ে কোন প্রকার সমালোচনাধর্মী আলোচনা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি।

এখানে উল্লেখ্য, রাজনৈতিক দুর্নীতি দমন করার জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব করা হয়েছিল তা আমরা সমর্থন করেছি এবং আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি এই প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হলে দেশে রাজনৈতিক দুর্নীতি অনেক কমে আসবে।

কিন্তু দুঃখজনক হল আওয়ামী লীগ শাসনামলে আওয়ামী লীগ নের্তৃবৃন্দেরই প্রস্তাবিত এই অনন্য ফর্মুলাটি নিয়ে কোন আলোচনা-সমালোচনা আমাদের চোখে পড়েনি। এতে আমরা কিন্তু বেশ অবাক হয়েছি[৭]। দেশের সংসদ ভরা আওয়ামী লীগের সাংসদ রয়েছেন, তার বাইরে রয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি দাবিদার অসংখ্য কীর্তিমান গবেষক, বুদ্ধিজীবী, কলামিস্ট এবং সাংবাদিক। কিন্তু তাদের কেউই কি আইএফডি সমর্থিত আওয়ামী লীগের এই প্রস্তাব সম্পর্কে অবহিত নন? তাদের কারোর কাছেই কি আওয়ামী লীগের এই প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি?

একইভাবে বলা যায়, **ঢাকার যানজট নিরসনে আইএফডি'র প্রস্তাবনা** শীর্ষক পেপারটি প্রকাশের পর ঢাকা শহরের যানজট দ্রুত নিরসনের সেরা ফর্মুলাটির খোঁজ আমরা এখনো পাইনি, যদিও পেপারটি প্রকাশের পর **ঢাকা'র কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা** বা এসটিপি নিয়ে সচেতনতা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে বলে আমরা মনে করি। এসটিপি'র বাস্তবায়ন নিয়ে যে সকল বিশেষজ্ঞ আগে নীরব ছিলেন, তাদের অনেকেই সরব হয়েছেন আমাদের পেপার প্রকাশের পর। সেই সাথে বিভিন্ন মিডিয়াতে সাধারণ নাগরিকরা ঢাকা'র যানজট নিরসনের জন্য তাদের নিজস্ব ভাবনা তুলে ধরেছেন[৮]। একাধিক

[৭] এখানে উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগের এই প্রস্তাবটি যখন জনসমক্ষে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, তখন ছিল বিএনপি'র শাসনামল। আমার কাছে কিন্তু তখনই মনে হয়েছিল যে এই প্রস্তাবটি সমর্থনযোগ্য।আমি যখন প্রশাসনে দুর্নীতি দমনের গবেষণা করছিলাম, তখন আমার মনে ইচ্ছা ছিল ভবিষ্যতে সময় এবং সুযোগ পেলে রাজনৈতিক দুর্নীতি দমন নিয়ে একটি গবেষণা আমি করব। এই বিষয়ে আমি চিন্তাভাবনাও শুরু করেছিলাম। কিন্তু আওয়ামী লীগ নের্তৃবৃন্দের এই প্রস্তাবটি আমি প্রথম যখন টিভিতে শুনি, তখনই আমার মনে হয়েছিল এটাই রাজনৈতিক দুর্নীতির সম্ভাব্য সমাধান।

[৮] এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় পরামর্শটি হল ঢাকা'র যানজট নিরসনের জন্য রাজধানীকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা। কিন্তু এই সমাধানের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হল বাংলাদেশ খুবই ছোট একটি দেশ এবং এখানে জমির পরিমাণ খুবই অল্প। তাই রাজধানীকে অন্যত্র সরানো সম্ভব নয়। আবার ঢাকাকে অন্যত্র সরালে বর্তমান ঢাকা'র কি হবে, সেখানে কে থাকবে, সেই ব্যাপারে কিন্তু কেউই আলোকপাত করেননি।

নাগরিকের চিন্তালব্ধ আইডিয়া সরকার বাস্তবায়নও করছে[১]। টিভি চ্যানেলগুলোর টকশোতে অংশ নেয়া বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত শুনেও আমাদের কাছে মনে হয়েছে তারাও আমাদের পরামর্শ সম্পর্কে অবগত।

পৃথিবীর উন্নয়নের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, আমাদের মত যুগে যুগে অনেক ব্যক্তিও কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের নানাবিধ আইডিয়া দিয়েছেন। এই আইডিয়াগুলো যখন তারা জনসমক্ষে প্রকাশ করেছেন, তখন তার দুর্বলতা এবং শক্তিশালী দিক নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে, এবং যখন এর চেয়ে ভাল আইডিয়া কেউ বের করতে পেরেছেন, তখন আগের আইডিয়া ত্যাগ করে সকলেই নতুন আইডিয়া গ্রহণ করেছেন। আর যখন এর চেয়ে ভাল আইডিয়া কেউ বের করতে পারেননি, তখন প্রস্তাবিত আইডিয়াকেই তারা সকলে মেনে নিয়েছেন। ফলে এভাবেই মানব সভ্যতা এগিয়েছে।

মানবসভ্যতার উন্নয়নের এই স্বাভাবিক ধারাকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করানোর জন্য আমাদের সবাইকে আশেপাশের সমস্যা নিয়ে ভাবতে হবে। না হলে এই সকল সমস্যার সমাধান কোনদিনই হবে না। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ যতই ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, মানুষ ততই আত্মকেন্দ্রিক হচ্ছে। ফলে বাইরের বিশ্বের সাথে তার যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠছে মিডিয়া। তাই মিডিয়া যে বিষয়টিকে হাইলাইট করছে না, সেই বিষয় নিয়ে মানুষ আর চিন্তা করছে না। বাংলাদেশের উন্নতির গ্রাফ ভবিষ্যতে যদি আরো দ্রুত উপরের দিকে উঠতে থাকে, তাহলে মিডিয়ার উপর এই নির্ভরতা দিন দিন বাড়বে, কমবে না।

[১] মধ্যমেয়াদে ঢাকা'র বিভিন্ন পয়েন্টে যানজট নিরসনের জন্য একাধিক ব্যক্তির প্রস্তাবিত সমাধান বর্তমানে সরকার বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে একটি হল 'ইউ-লুপ' এবং অপরটি 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি করিডর' যার আওতায় ৭৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে গাবতলি হতে আজিমপুর পর্যন্ত একটি সিগন্যালবিহীন করিডর তৈরি করা হবে (তথ্যসূত্রঃ প্রথম আলো এবং দি ডেইলি স্টার)। আমরা এই প্রকল্পগুলির প্রস্তাবকারীদেরকে অভিনন্দন জানাই। উভয় প্রকল্পের একটি বৈশিষ্ট্য হল, এই প্রকল্পগুলিতে বিকল্প সড়ক কিংবা আন্ডারপাস-ফ্লাইওভার তৈরি করে সিগন্যাল থেকে সৃষ্ট যানজট এড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে আমরা মনে করি, সিগন্যাল থেকে সৃষ্ট যানজট নিরসনের জন্য সবার আগে প্রয়োজন বিভিন্ন পয়েন্টে সিগন্যালগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন। এই ধরণের সমন্বয় করে নিউইয়র্কের ম্যানহাটন সিটি'তে যানজট নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। অসংখ্য এভিনিউ এবং স্ট্রীট দিয়ে গ্রীড আকারে বিন্যস্ত ম্যানহাটন সিটি'তে প্রচুর চৌরাস্তা রয়েছে, প্রতিটি চৌরাস্তায় রয়েছে একাধিক সিগন্যাল বাতি। কিন্তু তারপরও ম্যানহাটন সিটি'তে কোন ফ্লাইওভার বা সিগন্যাল এড়ানোর জন্য বিকল্প সড়ক সাধারণত দেখা যায় না। আসলে সিগন্যাল থেকে সৃষ্ট যানজট সমাধানের জন্য কেউ যদি চিন্তা শুরু করেন, তাহলে সবার আগেই যে সমাধানটি মাথায় আসে তা হল বিকল্প সড়ক তৈরি করা কিংবা অভারপাস-আন্ডারপাস-ফ্লাইওভার তৈরি করা। কিন্তু একটি সমাধান সমস্যাটির **'সেরা সমাধান'** কিনা তা বোঝার জন্য দেখতে হবে প্রস্তাবিত সমাধানটি ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ কিনা এবং এর চেয়েও কম ব্যয়ে এবং অল্প সময়ে একই সমস্যার সমাধান অন্য কোনভাবে করা যায় কিনা। যেমন, ৭৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে শুধু একটি সিগন্যালবিহীন করিডর তৈরি না করে আমরা একই অর্থ ব্যয়ে সারা শহরে বিআরটি ব্যবস্থার প্রচলন করতে পারতাম। ফলে সারা শহরের যানজট নিরসনে তা ইতিবাচক প্রভাব ফেলত।

আমরা মিডিয়ার উপর এই অস্বাভাবিক নির্ভরতাকে একটি আসন্ন সঙ্কট হিসাবে দেখছি, এবং এর নাম দিয়েছি **স্বাধীন চিন্তার সঙ্কট** বা Crisis of Independent Thinking। এই সঙ্কটের স্বরূপ হল, যতক্ষণ পর্যন্ত না মূলধারার মিডিয়াগুলো একটি বিষয়কে সামনে না আনছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই বিষয়টি নিয়ে কেউ কোন চিন্তা করছে না। আর যখনই মিডিয়া একটি বিষয়কে হাইলাইট করছে, তখনই তা হয়ে যাচ্ছে জাতীয় ইস্যু। ফলে সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের চিন্তাভাবনাও নিয়ন্ত্রণ করছেন মিডিয়ার মালিক এবং সম্পাদকরা।

এই বিষয়ে কিন্তু আমরা বিস্তারিত আলোকপাত করেছি **অবয়বহীন দুর্নীতি** পেপারের ১০৬ পৃষ্ঠাতে যেখানে আমরা জনমনে মিডিয়ার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছি।

এই বিষয়ে সাম্প্রতিক একটি উদাহরণ প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

অতি সম্প্রতি ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিশুক মুনীর সহ আরো তিন জন। এই দুর্ঘটনাটি ঘটার পর সর্বত্র আলোড়নের সৃষ্টি হয়। সকলেই এই দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন। মিডিয়াতে প্রকাশিত হয় অসংখ্য ড্রাইভারকে কোন প্রকার পরীক্ষা ছাড়াই ড্রাইভিং লাইসেন্স দেয়ার বিষয়টি। তাই সকলেই বলতে থাকেন এই সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী সরকারের ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত অনিয়ম।

কিন্তু যে বিষয়টি কেউ খেয়াল করেননি তা হল, এই দুর্ঘটনার জন্য যতটা না লাইসেন্স সংক্রান্ত অনিয়ম দায়ী, তার চেয়েও অনেক বেশি দায়ী অপ্রশস্ত রাস্তায় ডিভাইডার না থাকা[১০]। কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে কিন্তু কেউ ইস্যু সৃষ্টি করেননি কারণ মিডিয়া এই বিষয়টিকে হাইলাইট করেনি।

[১০] এর অর্থ হল এই সড়ক যদি প্রশস্ত হত এবং তাতে ডিভাইডার থাকতো, তাহলে ভুয়া লাইসেন্স থাকা সত্বেও এই সড়কে একই রকম দুর্ঘটনা ঘটতো না। এখানে উল্লেখ্য, প্রতিটি সড়ক দুর্ঘটনার জন্য অসংখ্য কারণ রয়েছে। প্রতিটি কারণের সাথে আবার দুর্নীতির পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। যেমন অপ্রশস্ত ডিভাইডারবিহীন রাস্তার কারণ যদি তালাশ করা হয়, তাহলে চলে আসবে আমাদের সম্পদের অপ্রতুলতার বিষয়টি। আবার সম্পদের অপ্রতুলতার জন্য যেমন সরকারের নানা রকমের ব্যর্থতা দায়ী, তেমনি দায়ী সরকারের বাইরের গোষ্ঠীর করফাঁকি দেয়ার প্রবণতা।

এখন বলার বিষয় হল, আমাদের সবকিছুই যদি মিডিয়ার লোকেরা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন, তাহলে তো দেশের সব শীর্ষপদে মিডিয়ার লোকদেরকেই বসিয়ে দেয়া উচিত। গবেষক, বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি রেখে তো আর লাভ নেই।

অনেকে মনে করতে পারেন আমাদের দেশে গবেষণা খাতের দৈন্য দশার জন্য দায়ী মূলত সম্পদের অপ্রতুলতা এবং প্রয়োজনীয় টাকার অভাব। কিন্তু আমরা বলব, একটি সমস্যা কেন হচ্ছে, প্রস্তাবিত সমাধানটি কেন কাজ করছে না, কিংবা একটি সমাধানের চেয়েও ভাল অন্য আরেকটি সমাধান আছে কিনা, এই ধরণের প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মনমানসিকতা না থাকলে মিলিয়ন ডলার খরচ করেও কোন মানসম্পন্ন গবেষণা হবে না। দেশে নানা চড়াই উতরাই পেরিয়ে ইতিমধ্যেই যারা দেশসেরা কীর্তিমান গবেষকদের খাতায় নাম লিখিয়েছেন, তাদের অনেকেই কিন্তু রীতিমত টাকার উপরে বসে আছেন। কিন্তু তারপরও বাংলাদেশের সমস্যাগুলোর সমাধান কেন হচ্ছে না? এই প্রশ্নের উত্তর কি?

পৃথিবীতে যত বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে, এবং যে সকল বিজ্ঞানীরা এই সকল বড় বড় আবিষ্কার করেছেন, তারা কিন্তু কেউই টাকার অভাবের জন্য আবিষ্কার থামিয়ে বসে থাকেননি। এই ধারা বাংলাদেশেও শুরু হয়েছে।

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের দুইজন বিজ্ঞানী দুটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার করেছেন। এদের একজন মি. গিয়াসউদ্দিন কচি তৈরি করেছেন জ্বালানি বিহীন জেনারটের এবং অপরজন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মোঃ কামরুল আলম খান আবিষ্কার করেছেন পাথরকুঁচির পাতা থেকে বিদ্যুৎ তৈরির উপায়। এই দুই বিজ্ঞানীর কেউই কিন্তু বিরাট অর্থশালী নন, এবং তাদের মধ্যে মি. কচির কোন উচ্চতর ডিগ্রী নেই[১১]। কিন্তু তারপরেও তারা নতুন কিছু আবিষ্কারে পিছপা হননি।

আমরা দেশের এই দুইজন প্রতিশ্রুতিশীল বিজ্ঞানীকে তাদের আবিষ্কারের জন্য অভিনন্দন জানাই। এবং আমরা মনে করি, সরকার যেমন পাটের ডিএনএ সংক্রান্ত গবেষণায় এগিয়ে এসেছে, তেমনি এই দুটি আবিষ্কার উন্নয়নের জন্যও সরকার তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে।

[১১] তথ্যসূত্রঃ দৈনিক নয়াদিগন্ত।

এই দুইজন বিজ্ঞানীর মত আরো অসংখ্য সম্ভাবনাময় বিজ্ঞানী এবং চিন্তাবিদ বাংলাদেশের আনাচ-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন যাদের চিন্তালব্ধ আইডিয়ার সুফল পেতে পারে সাধারণ মানুষ। এই ধরণের সুফল নিশ্চিত করার জন্য সবাইকে চিন্তা করতে উৎসাহিত করতে হবে। চিন্তা করার উপায় চিনিয়ে দিতে হবে। আর সবার চিন্তাশীল মননকে আরো বেশি প্রখর এবং ক্রিয়াশীল করে দেশ, জাতি এবং সর্বোপরী মানবতাকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যই তৈরি হয়েছে **আইডিয়াস ফর ডেভলপমেন্ট (আইএফডি)**।

সংযুক্তি ১

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পাঠানো আইএফডি'র চিঠি

Ref: 01/2009
July 3, 2009

Sheikh Hasina
Hon'ble Prime Minister
Government of Bangladesh

Subject: Legalizing Undisclosed Income

Dear Madam,

Assalamualaikum.

This is M. Mahmood, an expatriate Bangladeshi national currently residing in Saudi Arabia. I have recently founded a virtual think tank named *Ideas for Development (IFD)* in order to generate and disseminate innovative ideas relating to all aspects of development. I will announce its official launching very soon inshallah with the release of its first *Exclusive Paper* titled "Indefinite Corruption".

I am now writing to you to share some of concerns regarding the provision for legalizing the undisclosed income in the Budget for 2009-2010. I will be grateful if you spend some time for reading my thoughts regarding this controversial provision.

To my understanding, legalizing undisclosed income does not have any economic value unless the provision is supported by an *effective* anti-corruption drive. The provision has an economic value if people tend to utilize this facility by whitening their black money. It loses its value if people do not utilize the facility even if the provision is kept open.

This has been observed during the past regimes when the provision was kept open without any concurrent anti-corruption drive. People did not utilize the facility because there was no fear for holding the black money. However, during the past caretaker regime, the facility was given while there was an aggressive anti-corruption drive. The result was obvious. People whitened a significant

amount of black money, although the expectation for utilizing the facility was much higher. The high expectation was not met due to the fact that, at that time, the Government had attached a cautionary statement along with the facility as well as brought a distinction between *legal* and *illegal* source of income.

In my view, such a distinction and cautionary statement confused the people concerned, and as a result, they did not come forward to legalize their black money in a significant proportion. I wrote a similar letter to the former Finance Advisor outlining my concerns, and requested him to remove such distinctions and cautionary statements.

I am now aware that this year, the present Government also allowed to legalize the black money in certain economic sectors, although there is no general apprehension that an anti-corruption drive is forthcoming. Therefore, I believe that expectation regarding the use of the facility would not also be met this year as well.

However, I was not at all aware that the Government had allowed people to whiten their black money by investing in the stocks that are listed in the stock exchange. I did not read any such news in the print media when the Budget was announced.

I have just read in the newspaper that the share market is showing a bullish trend due to the influx of black money in the market. Then I confirmed the fact after reading the budget speech that the Government had truly allowed to legalize the black money through investing in the listed shares.

I have great reservation against whitening the black money through investing in stocks of listed companies.

In my view, such a provision would in fact reward the black money holders through capital gains instead of punishing them through a 10% levy. I believe the stock market in Bangladesh is controlled by a syndicate of large investors who decide in advance the movement of share prices. Therefore, if provision for whitening black money through shares of listed companies is given, they will invest their black money in the stocks and raise the market intentionally. Eventually, a point will come when the market will be overheated, and plunge all on a sudden as it was the case during the past Awami League regime.

This is to be noted that circulation of black money in the stock exchanges is a continuous process, and since people do not properly disclose the amount of total investments, such flows remain undetected by the Government. But if the Government allows the investors to whiten their black money by investing in listed shares, it will act as an incentive for the large investors to artificially inflate the market and receive benefits at the expense of the small investors. If the process continues, the large investors will be able to legalize a significant amount of black money by investing less.

I think the provision for whitening the black money should be given only to the new industries that are not yet listed and not being traded. This will allow the businessmen to set up new industries and

generate employment. This provision can also be kept open for the new industries that intend to be listed in the stock exchange for the first time through the IPOs. But the Government should notallow whitening the black money through the transaction of shares that are already listed and being traded.

If the black money is legalized through buying and selling listed shares, it will not generate any additional employment, rather encourage gambling in the market. It does not also raise the productivity level of the country. It increases only the speculative behavior of the market participants. If black money holders are rewarded in this manner, they will tend to utilize the facility even if there is no fear for holding the black money, meaning there is no anti-corruption drive ongoing in the country.

A similar proposition for rewarding the black money holders through the issuance of Bonds was also proposed by the present FBCCI President. Bond is a financial instrument that carries a yearly interest rate, and at the end of the maturity period, the bondholder is entitled to receive the principal. It acts as same as fixed deposit accounts in the Banks. Therefore, if black money holders can whiten their black money by only paying 10% penalty, and eventually receive a yearly bonus of 8%, then don't you think that such people will be rewarded instead of being punished?

In this connection, my recommendations are as follows:

(a) The Government should announce that it will launch an anti-corruption drive very soon and will look for black money holders.
(b) The Government should allow legalizing the black money through investments in new industries only. The privilege for legalizing the black money through the investments in listed shares should be immediately withdrawn.
(c) The Government can control the flow of black money to the most priority sectors by adjusting the tax rate in a staggered manner. For example, investments of black money in new construction (such as apartments, buildings, etc.) can be charged at 20% rate, all other sectors at 10% and investments in PPP Projects can be charged at a rate of 5% only.
(d) For legalizing the cash bank deposits, the black money holders have to pay 5-10% extra in addition to the normal income tax rate.
(e) The Government should raise the abovementioned tax rates periodically to encourage the black money holders to legalize their income quickly.

If such an effective anti-corruption drive persists in the economy, and at the same time, people are allowed to legalize their black money, they will tend to legalize their undisclosed income in phases, and as a result, a golden moment will come when there will be no circulation of black money in the economy. At that point, the Government should withdraw this particular facility for good, and start monitoring the disparity of income, expenses and savings of its citizens to detect corruption.

In order to eliminate corruption from the society, the Government should also bring reforms in the public administration so that there is strict accountability mechanism along with a decent pay

structure of the Government servants. In addition to that, the power of the Government servants should also be reduced through appropriate reform mechanisms.

Therefore, I fervently request you to reconsider this particular provision in light of the above discussion for the greater interest of the nation.

With best regards.

Sincerely,

(M. Mahmood)
Founder
Ideas for Development (IFD)

লেখকের নিজের কথা

জন্মস্থান বাংলাদেশের সিলেট জেলা। বর্তমানে সৌদি আরবে একটি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিংয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স সম্পন্ন করেন যথাক্রমে ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালে। পাশ করার সাথে সাথেই ঢাকা'র সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগে (সিপিডি) ইন্টার্ন হিসাবে গবেষণা জীবনের শুরু।

পরবর্তীতে আবারো মাস্টার্স করতে পাড়ি জমান ইউএসএ'তে। এবারের গন্তব্য ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ড – কলেজ পার্ক। সেখান থেকে ফিন্যান্সে মাস্টার অফ সাইন্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন ২০০২ সালে।

ফিরে আসেন আবার বাংলাদেশে ২০০৩ এর শেষের দিকে। পুনরায় যোগ দেন গবেষণা কাজে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময় থেকে পত্রিকায় লেখালেখি শুরু হলেও লেখক হিসাবে পূর্ণ আত্মপ্রকাশ ঘটে সাপ্তাহিক ***'যায়যায়দিন'*** পত্রিকার মাধ্যমে। ২০০৪–২০০৬ সময়কালে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, এবং নীতিহীনতা নিয়ে তার একাধিক রচনা সাপ্তাহিক যায়যায়দিনে প্রকাশিত হয়েছে। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক জার্নালে তার একাধিক গবেষণা প্রবন্ধও রয়েছে।

মি. মাবরুর মাহমুদ বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক। অবসর সময়ে তিনি টিভি দেখেন, গবেষণা করেন, ইন্টারনেট ব্রাউজ করেন, এবং পরিবারের সাথে সময় কাটান।

আইএফডি পরিচিতি

Ideas for Development (IFD) একটি ভারচুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাংক (Virtual Think Tank)। এর মূল ধারণার প্রকাশ ঘটে ২০০৭ সালের জানুয়ারী ১৮ তারিখে একটি ইমেইলের মাধ্যমে। এই থিঙ্ক ট্যাংকটির কোন অফিস নেই। এর ওয়েব এবং ইমেইল এড্রেসই এর ঠিকানা। এই থিঙ্ক ট্যাংকটির উদ্যোক্তা সৌদি আরব প্রবাসী মি. মাবরুর মাহমুদ। তিনি একজন বাংলাদেশি নাগরিক। আইএফডি তারই চিন্তার ফসল।

এই ভারচুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাংকটির মূল উদ্দেশ্য ইন্টারনেটের শক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আইডিয়ার আদান প্রদানের মাধ্যমে দেশ, জাতি এবং সর্বোপরী মানবতার সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা। এটাই এই থিঙ্ক ট্যাংকটির মিশন স্টেটমেন্ট।

এই মিশন স্টেটমেন্ট প্রতিফলিত হয়েছে এই থিঙ্ক ট্যাংকটির লোগোতেও। এর লোগোতে চার রঙের ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে। এই চারটি রঙের মাধ্যমে বিশ্বের চারটি জাতি বা রেসকে (Race) বোঝানো হয়েছে। আইএফডি বিশ্বাস করে বর্তমান বিশ্বে যে অস্থিরতা এবং অশান্তি রয়েছে, তার মূলে রয়েছে জাতিগত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য। তাই আমরা বিশ্বাস করি এই নানাবিধ বৈষম্য যদি দুর করা যায়, তাহলে বিশ্বে অস্থিরতা অনেক কমে আসবে।

কিন্তু বৈষম্য কমানোর জন্য চাই নতুন নতুন উন্নয়ন আইডিয়া। বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর জাতিগুলি বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে নিত্যনতুন উন্নয়ন আইডিয়া তৈরি করছে এবং তার সফল বাস্তবায়ন করে দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্বল্পন্নোত দেশগুলি সম্পদ কম থাকার কারণে বা সম্পদের যথেচ্ছ অপব্যবহারের কারণে এই প্রতিযোগিতায় দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। ফলে উন্নত এবং উন্নয়নকামী দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান বাড়ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে দারিদ্র্য এবং শোষণ।

বিভিন্ন আইডিয়া উদ্ভাবনের মাধ্যমে জাতিগত এই ব্যবধান কমানোর একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আইএফডির সৃষ্টি। আইএফডি বিশ্বের সকল চিন্তাশীল এবং উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী মানুষদের আইডিয়া আদান প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হতে চায়। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে চিন্তাশীল মানুষরা তাদের আইডিয়ার আদান প্রদান করবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আইএফডির মাধ্যমে আইডিয়া আদান প্রদান করলে একজন উদ্ভাবক বেশ কয়েকটি সুবিধা পাবেন।

প্রথমত, উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য আইডিয়া তৈরি করাই শেষ কাজ নয়, বরং এটি পুরো প্রক্রিয়াটির শুরু মাত্র। একজন উদ্ভাবককে শুধু আইডিয়া তৈরি করলেই চলবে না, বরং একটি সমস্যার চুলচেরা বিশ্লেষনের মাধমে তার নতুন আইডিয়াটি দিয়ে সমস্যাটি কিভাবে সমাধান করা যাবে তা উপস্থাপন করতে হবে একটি মডেলের আকারে। সেই মডেল আবার বাস্তবায়নযোগ্যও হতে হবে। এর অন্যথা হলে সেই আইডিয়াটির আসলে কোন মুল্য নেই।

আমাদের চারপাশে নতুন আইডিয়া দেয়ার লোকের আসলে কোন অভাব নেই। তবে একটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত এবং সর্বোপরী বাস্তবায়নযোগ্য আইডিয়া প্রণেতার সঙ্কট সর্বত্রই।

এই সঙ্কট সমাধানকল্পে আইএফডি একজন উদ্ভাবককে তার আইডিয়া সুন্দরভাবে উপস্থাপনের পথ দেখিয়ে দেবে। এক্ষেত্রে আইএফডি সম্ভব সবরকম গাইডেন্স প্রদান করবে এবং একটি সম্ভাবনাময় অথচ অপরিপক্ক আইডিয়াকে পরিপুর্ণ করতে সকল ধরনের সহায়তা প্রদান করবে।

দ্বিতীয়ত, আইএফডিতে আইডিয়া পাঠানোর জন্য কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। যে কোন ব্যক্তি যে কোন স্থান থেকে যে কোন মাধ্যমে আইএফডিতে আইডিয়া পাঠাতে পারেন।

তৃতীয়ত, বর্তমানে আইএফডি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক আইডিয়া আদান প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করলেও ভবিষ্যতে অন্যান্য অনেক বিষয়ও ধীরে ধীরে এর কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

চতুর্থত, আইএফডির মাধ্যমে কোন আইডিয়া প্রচার করা হলে সেই আইডিয়াটি যে একটি সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, সে ব্যাপারে সকলেই নিশ্চিত থাকবেন। ফলে আইডিয়াটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। এখানে বলে রাখা দরকার, আইএফডি যে কোন আইডিয়া পেলেই তা প্রচার করবে না। বরং একটি আইডিয়ার মাধ্যমে সমাজ কতটুকু উপকৃত হতে পারে, সেটাই হবে আইডিয়া নির্বাচন করার মুল ভিত্তি।

এবং পঞ্চমত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল, আইএফডিতে আইডিয়া পাঠাতে হলে উদ্ভাবককে কোন খরচ করতে হবে না, শুধুমাত্র পোস্ট কিংবা ইমেইলের খরচ ছাড়া। এই আইডিয়া যদি প্রচারযোগ্য হয়, তাহলেও উদ্ভাবককে কোন প্রকার ফি বা চার্জ দিতে হবে না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কোন এক চিন্তাশীল ব্যক্তি কোন সম্ভাবনাময় আইডিয়া দিলে তা চুরি হয়ে যেতে পারে। ফলে একজন আইডিয়ার উদ্ভাবক বঞ্চিত হবেন তার যথাযথ স্বীকৃতি থেকে।

এক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আইএফডির কাছে কেউ কোন আইডিয়া পাঠালে তা উদ্ভাবকের অনুমতি ছাড়া অন্য কোথাও অন্য কোন নামে ব্যবহার করা হবে না। আমাদের মতে, শুধুমাত্র একজন আইডিয়ার কারিগরের পক্ষেই সম্ভব অন্য আরেকজন আইডিয়ার কারিগরকে যথার্থ মুল্যায়ন করা।

আইএফডি বিশ্বাস করে একটি আইডিয়ার প্রকৃত মুল্যায়ন হয় তখনই যখন তা আংশিক বা পুর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং তা মানুষের কাজে লাগে। এ দিক থেকে আইএফডির একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ অনেক উন্নয়নমূলক আইডিয়ার সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার সহ অন্যান্য অনেক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তাই আইএফডি এমন কোন নিশ্চয়তা দিতে পারবে না যে আইএফডির মাধ্যমে কোন সম্ভাবনাময় আইডিয়া প্রচার হলেই তার সফল বাস্তবায়ন হবে। আইএফডি শুধু আইডিয়া তৈরি এবং প্রচারের প্ল্যাটফর্ম হিসাবেই কাজ করবে। এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব আইএফডির নয়।

তবে আইএফডির কার্যক্রম শুধুমাএ আইডিয়া তৈরি এবং তার প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। আইডিয়া তৈরি এবং তার সফল বাস্তবায়নের জন্য যেমন প্রয়োজন চিন্তাশীল মানুষ, তেমনি প্রয়োজন সঠিক রাজনৈতিক নের্তৃত্ব, বলিষ্ঠ সরকার কাঠামো, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সর্বোপরী একটি শান্তিপুর্ণ রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ। উপযুক্ত পরিবেশ না থাকলে চিন্তাশীল মানুষের যেমন জন্ম হবে না, তেমনি অস্থিতিশীল সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশে চিন্তাশীল মানুষদের উন্নয়ন আইডিয়ার যথার্থ মুল্যায়ন এবং বাস্তবায়নও হবে না।

তাই উন্নয়ন আইডিয়া প্রচারের পাশাপাশি আইএফডি এমন একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করবে যার মাধ্যমে যেন সমাজে সৃষ্টিশীল মানুষদের সংখ্যা বাড়ে, তাদের যথার্থ মুল্যায়ন হয় এবং তাদের আইডিয়ার সফল বাস্তবায়ন হয়। এই লক্ষ্যে আইএফডি বিভিন্ন ইস্যুতে তার মতামত ব্যক্ত করবে এবং বিভিন্ন রচনা প্রচার করবে।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, আপনি যদি আপনার কোন আইডিয়া নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হোন, এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন এই আইডিয়াটি বাস্তবায়িত হলে সমাজের কিছু কল্যাণ সাধিত হবে, তাহলে আইডিয়াটি আমাদেরকে লিখে পাঠান। এর জন্য প্রাথমিকভাবে ইমেইল করুন আমাদের ঠিকানায়। আমাদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট।

আমাদের বিশ্বাস এই ধরণের আইডিয়া আদান প্রদানের মাধ্যমে সর্বএ নতুন নতুন চিন্তাশীল মানুষের বিকাশ ঘটবে। তাদের চিন্তালব্ধ আইডিয়ার সফল বাস্তবায়ন হলে লাভবান হবেন সকলেই। তাই এর জন্য প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা। আইএফডির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক আইডিয়া প্রচারের জন্য যে কোন প্রকার সহযোগিতাকে তাই আমরা স্বাগত জানাই।

[Keyword for Websearch: Two Years and 33 Days of IFD, IFD Special Article 4, Corruption, Traffic Congestion in Dhaka, Mega Projects, Saifur Rahman, Dollar Store, Black Money, Bangabandhu, Death Penalty, Awami League, Bangladesh Government, Bus Rapid Transit]